# মজানো দশ

দীপঙ্কর বিশ্বাস

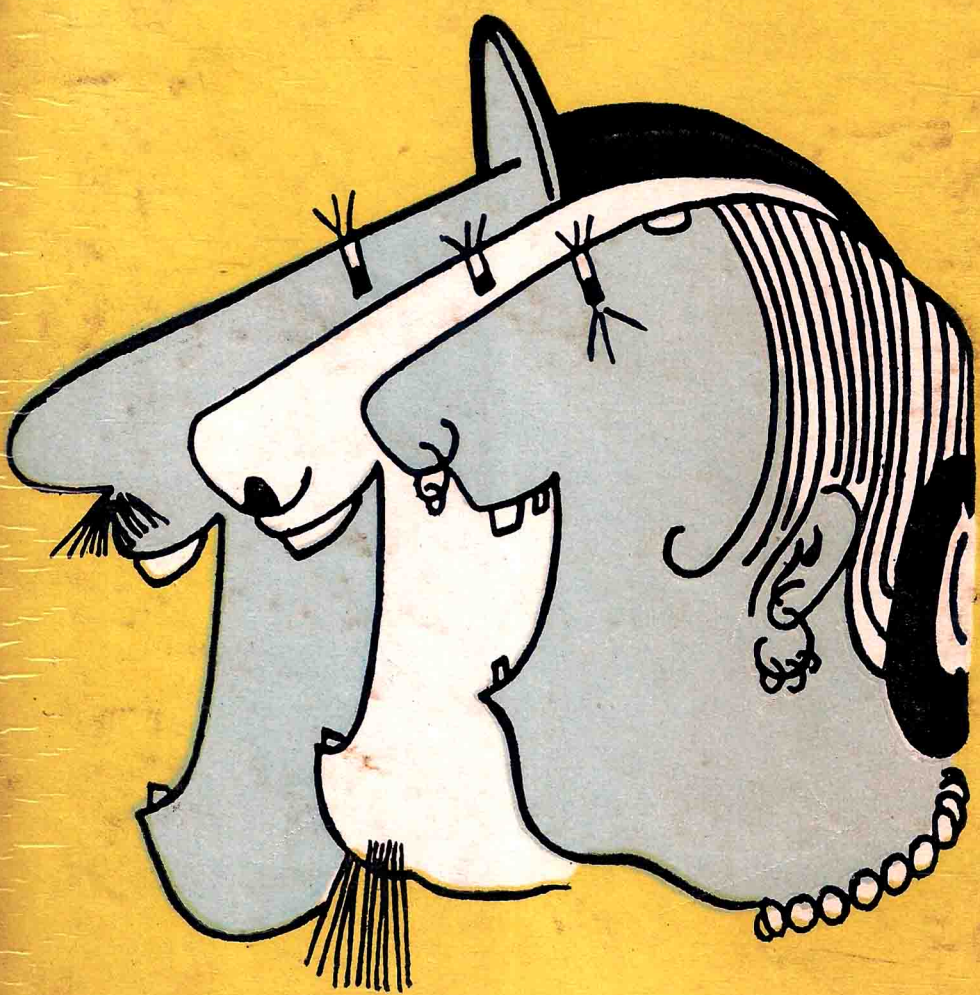

# মজানো দশ

দীপঙ্কর বিশ্বাস

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

papai

'মজানো দশ'-এর হাসির গল্পের বেশ ক'টি শুকতারা ও আনন্দমেলায় বেরিয়েছে। পাঠকদের ভালো লাগার থেকেই 'মজানো দশ'-এর জন্ম। আশা রইল বাকি গল্পগুলিও পাঠকদের ভালো লেগে এই সংকলন সফল করবে।

কিছু সাহায্যের জন্য শ্রীমতী সুজাতা বিশ্বাস, শ্রীমতী অঞ্জলী বিশ্বাস ও নিউ বেঙ্গলের শ্রীসুকুমার মল্লিকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বিনীত—

**দীপঙ্কর বিশ্বাস**

## এতে আছে—


| | | | |
|---|---|---|---|
| পেল্লাদের কাণ্ড | ... | ... | ১ |
| কুরুটাসন | ... | ... | ১১ |
| আরোগ্যাসন | ... | ... | ২২ |
| মাধ্যাকর্ষণ | ... | ... | ৩৪ |
| কুঁ-কুঁ-কুঁ | ... | ... | ৪৪ |
| দাঁতের মাজন ঝক্‌মকি | ... | ... | ৫৭ |
| বলাইবাবুর বিপদ | ... | ... | ৭২ |
| মানিব্যাগটা দেখি | ... | ... | ৮৫ |
| ধার | ... | ... | ৯৮ |
| বসে আঁকো | ... | ... | ১০৫ |

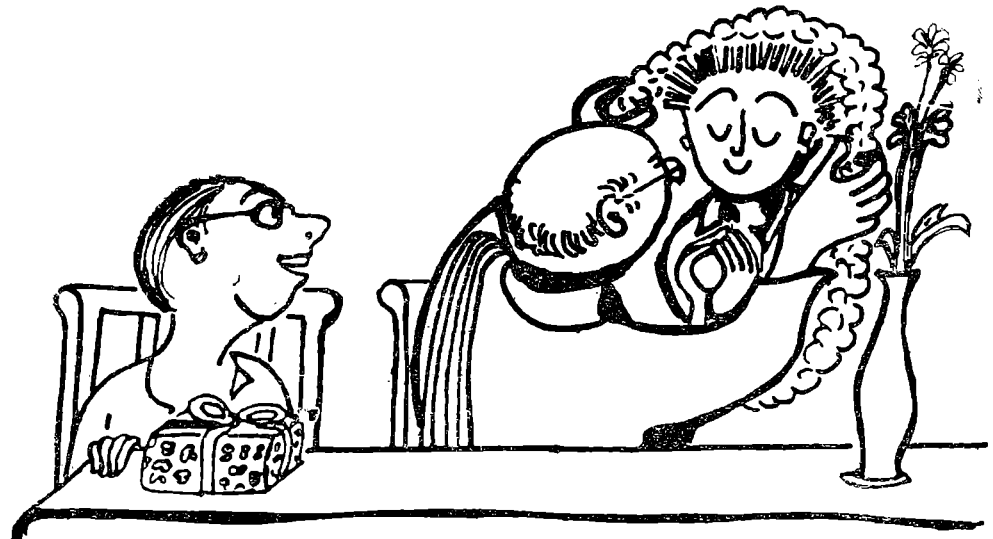

# পেল্লাদের কাণ্ড

স্কুল-হস্টেল ছেড়ে দিনতিনেক বাড়িতে ছিলাম। সোমবার যখন ঘুম থেকে উঠলাম, তখন আটটা বেজে গেছে। জামাকাপড় আর বইপত্র ব্যাগে ভরে ভাত খাচ্ছি, খাচ্ছি না বলে গিলছি বলাই ভাল, কাগজে চোখ বোলাতে বোলাতে একটা খবর দারুণ চাঞ্চল্যকর মনে হল। খবরটা প্রায় মুখস্থ করে ফেললাম। স্কুলে গিয়ে বন্ধুদের বলতে হবে। ঝিঙে, পটল ইত্যাদি, আর মুখস্থ হল না, চলে গেল থালার তলায়।

ইস্কুলে পেঁছিতে আমার একটু দেরিই হয়েছিল সেদিন। কাগজের গল্পটা রং চড়িয়ে বন্ধুদের বলব বলে ঠিক করছিলাম, যদি ওরা না পড়ে থাকে। কিন্তু ইস্কুলে ঢুকেই আমি হতভম্ব। সব ঘুলিয়ে গেল। ইস্কুলের মাঠে ছেলেদের ভিড়, ক্লাস-টাস মোটেই হচ্ছে না। নিশ্চয়ই ছুটি হয়ে গেছে। বিখ্যাত কেউ মারা গেছেন হয়তো। হ্যাঁ, তাই তো



pathagar.net

papai

মনে হচ্ছে। ছেলেরা সব টিচারস' রুমের কাছে ভিড় করে আছে। দু-একজনের হাতে ফুলের মালা-টালাও দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু একটা ব্যাপার মিলছে না। দুঃখের কোনও ছায়া নেই কোথাও। সকলে বেশ আনন্দেই আছে মনে হচ্ছে। আমাকে দেখেই নয়ন দৌড়ে এল। "কীরে খবরটা দেখেছিস কাগজে?"

তার মানে নয়নও দেখেছে খবরটা? আমি বললাম, "হ্যাঁ, তা আর দেখব না?"

"সাঙ্ঘাতিক না? সাহস আছে বলতে হবে।"

"তা না হলে ওই ভিড়ের ভেতর দিয়ে তিরিশ গজ..."

"তাই বলে তুই অত বাড়াস না, দশ ফুটকে তিরিশ গজ করে দিস না।"

"আমি বাড়াব কেন? বাড়িয়ে থাকলে কাগজওলারাই বাড়িয়েছে।"

"বল্, এমনটা আমরা কখনও আশা করেছিলাম কি?"

"আমরা কেন, কেউই করেনি।"

"যখন ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখন মুখটা নিশ্চয়ই দেখার মতন হয়েছিল।"

ওরা খবরটা আগেভাগে জেনে ফেলাতে গল্পটা মাঠে মারা গেল, মেজাজটা একটু বিগড়েই ছিল। বললাম, "ট্রামের নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগের চেয়ে পরেই মুখটা বেশি দেখার মতন হয়।"

"ট্রামের নীচে-ফিচে কী যা-তা বলছিস?"

"ঠিকই বলছি। তুই এক্ষুনি বলবি ওটা ট্রাম নয়, গোরুর গাড়ি।"

প্রহ্লাদ পাল, মানে আমাদের পেল্লাদ, দুটো জবরদস্ত গুণ্ডার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হিস্ট্রির স্যার ভূপতিবাবু আর ওঁর মাইনের টাকাটা বাঁচিয়েছে? তুই খবরটা কাগজে পড়িস্নি? 'বীর কিশোরের হাতে ডাকাতেরা বিধ্বস্ত'?"

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। "বলিস কী রে, এত্ত সব করেছে আমাদের পেল্লাদ?"

পেল্লাদের চেহারাটায় মনের মধ্যে আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। নামের সঙ্গে মিলিয়ে পেল্লাদের চেহারাটা হওয়া উচিত ছিল পেল্লায়। কিন্তু তা না হয়ে পেল্লাদটা হয়েছে পুঁইশাকের মতন। রোগা ল্যাকপ্যাকে হাড্ডিসার ডিগডিগে চেহারার ওপর একটা বড় সাইজের মাথা। খ্যাংরা-কাঠির ওপর আলুর দমের কথা মনে করিয়ে দেয়।

আমার মুখের ভাবটা দেখে নয়ন বলল, "বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?

pathagar.net

সকলেরই প্রথমটা অমন হয়েছিল। কিন্তু খবরের কাগজের খবর তো আর মিথ্যে নয়। আর হেডস্যার বলেছেন, 'বুঝলে, মানুষের মন আর বুদ্ধির জোরই আসল জোর। তাছাড়া ঈশ্বরের ইচ্ছায় কী না হয়। পঙ্গু যদি গিরি লঙ্ঘন করতে পারে'…"

আমি বাকিটা শেষ করে দিই। "তখন পেল্লাদের পক্ষে ডাকাতকে ল্যাং না-মারার কী আছে? মানে ঈশ্বরের ইচ্ছেয় পঙ্গু লঙ্ঘায়েত্ গিরি। তা পেল্লাদ ল্যাঙ্গায়েত্ ডাকাত আর বেশী কি? হেডস্যার ঠিকই বলেছেন, বুদ্ধিই আসল জোর। বেদে না কোথায় কে যেন বলেছিলেন না, বুদ্ধির্যস্য…তাতে কী সব যেন নিপাতিত।"

"স্যারেরা আর ছেলেরা সবাই মিলে পেল্লাদকে সংবর্ধনা দেবে ঠিক করেছে। তার সঙ্গে দেবে…উঃ উঃ, আরে বল্ না, যেটা সংবর্ধনার সঙ্গে দেয়।"

আমি মনের ভেতর একটু হাতড়ালাম। "উপহার?"

"ধ্যাত, উপহার তো লোকেদের জন্মদিনে দেয়। ওই ধরনেরই ঢাকনা দেওয়া কী,…কী একটা আছে না?"

বুদ্ধিমানেরা একভাবেই ভাবে। আমি বললাম, "উপঢৌকন?"

নয়ন বলল, "হ্যাঁ, ভূপতিবাবু আর অন্য স্যারেরা প্রচুর উপঢৌকন দেবেন বলেছেন। দেখছিস না ওদিকে ভিড় হয়ে রয়েছে। সংবর্ধনার তোড়জোড় চলছে।"

নয়নের হাতের খবরের কাগজটা আমি ছোঁ মেরে নিয়ে নিলাম। মোটেই খুঁজতে হল না। খবরটার চারপাশে মোটা করে দাগ দেওয়া হয়েছে নীল কালিতে।

## বীর কিশোরের হাতে ডাকাতেরা বিধ্বস্ত

শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে-ছটার সময় দুই জেল-পালানো আসামি শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ের কাছে জনৈক স্কুল-মাস্টারকে ভোজালি দেখিয়ে ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে। এক কিশোরের বীরত্বে ডাকাতদের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। প্রকাশ, কিশোরটি ওই শিক্ষকেরই ছাত্র। স্যারের বিপদে সে নিজের জীবন বিপন্ন করে ডাকাতদের ধরাশায়ী করে এবং পুলিশের হাতে তুলে দেয়। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে আরও জানা যায় যে, কিশোর বাজার করে ফিরছিল। স্যারের বিপদ দেখে সে নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে প্রথমে একটি ইট ছোঁড়ে ভোজালিওলা ডাকাতটির

মুখে। তার অব্যর্থ টিপে ডাকাতটি মুহূর্তে ধরাশায়ী হয়। কিশোরটি তৎক্ষণাৎ দৈত্যের মতন দশ ফুট লাফ দিয়ে চেপে বসে ওই ডাকাতের

বুকে এবং কেড়ে নেয় ওর হাতের ভোজালিটি। বেগতিক দেখে অপর ডাকাতটি পালাতে গেলে জনতা তাকে ধরে ফেলে। বেশ করে পিটুনি লাগানোর পর জনতা ডাকাত দুটিকে তুলে দেয় শ্যামপুকুর থানার বড়বাবুর হাতে। কলকাতার সব থানাই এই দুই দাগি জেল-পালানো আসামির সন্ধানে ছিল। শ্যামপুকুর থানার ও. সি. কিশোরের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে তাকে নিজের থেকে যথাযোগ্য পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিশোরের নাম শ্রীপ্রহ্লাদ পাল।"

খবরটা পড়ে আমার নিজের ওপর ঘেন্না ধরে গেল। আমাদের পেল্লাদের এত বড় খবরটা আমার চোখ এড়িয়ে গেল? এইজন্যই আমি অঙ্কে কম নম্বর পাই। দরকারি জিনিসগুলো সবই চোখ এড়িয়ে যায়।

টিচারস' রুমের কাছে পৌঁছে দেখি, প্রহ্লাদ ইতস্তত বিচরণ করছে; হাবভাব দেখে পেল্লাদকে চেনাই মুশকিল। জামার আস্তিন গুটোনো, ভারী পদক্ষেপ, চোখে গরগরে চাউনি। পট করে দেখলে মনে হবে, টারজানকে জঙ্গল থেকে ধরে এনে টিচারস' রুমের সামনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

পেল্লাদ আমার খুউব বন্ধু। আমাকে দেখেই এগিয়ে এসে বলল, "যাক, তুই এসে গেছিস। তুই না থাকলে এই সংবর্ধনা-টংবর্ধনার আনন্দ কার সঙ্গে ভাগ করতাম বল ?"

আমি একটু গর্বিত না হয়ে পারি না। পেল্লাদের বীরত্ব আমাদেরই বীরত্ব। পেল্লাদের গৌরব, সেও তো আমাদেরই। আমিও জামার আস্তিন গোটাতে গোটাতে বললাম, "তোর সংবর্ধনায় আমি কি না এসে থাকতে পারি ?"

দেখলাম সংবর্ধনা-সভায় সবাই আছে, নেই কেবল কতকগুলো ছেলে, যারা পেল্লাদের পেছনে লাগত। অমল, গদাই আর দীনেশ। ওরা বোধহয় ভয় আর হিংসেয় লুকিয়ে মুখ বাঁচাচ্ছে।

সংবর্ধনা-সভার প্রস্তুতি শেষ। আমরা ক্লাস এইটে পড়ি। জুনিয়র সিনিয়র, প্রায় সবাই জমায়েত হয়েছে মাঠের এইপাশে, যেখানে দুপুরের আগে রোদ্দুর পড়ে না। একটা সাদা টেবিল-ক্লথ মোড়া টেবিল। তার ওপর দুটো ফুলদানিতে প্রচুর ফুল। টেবিলের ওদিকে অনেকগুলো চেয়ার। একটাতে বসেছে প্রহ্লাদ, আর অন্যগুলোতে প্রবীণ স্যারেরা মানে সংস্কৃতের বাচস্পতিমশাই, হেডস্যার আরও অনেকে। চেয়ারের অভাবে যে সমস্ত স্যার বসতে পাননি, তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন ওদের পেছনে। শোনা গেছে ক্লাস টেনের সরিৎদা পেল্লাদকে নিয়ে একটা কবিতাও লিখে ফেলেছে।

সভারম্ভ করলেন হেডস্যার, "প্রহ্লাদের বীরত্বের কাহিনী তোমরা সকলেই কাগজে পড়েছ। প্রহ্লাদ শুধু ভূপতিবাবুর জান, মান আর টাকাই বাঁচায়নি, আমাদের ইস্কুলের আদর্শকে তুলে ধরেছে বহুগুণ। মানবিকতার এরকম নজির আজকের দিনে বিরল। প্রহ্লাদ ভূপতিবাবুকে না-দেখার ভান করে চলে যেতে পারত। কিন্তু তা সে যায়নি। শুধু তা-ই নয়, জীবন বিপন্ন করে ভূপতিকে ধনেপ্রাণে বাঁচিয়েছে। আমরা স্যারেরা প্রহ্লাদের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে ওর হাতে তুলে দিচ্ছি সামান্য উপহার এই বইটি—'বিশ্বের বীরত্বের বিবরণ।' আমি কামনা করি, ঘরে-ঘরে পাড়ায়-পাড়ায়, রাস্তার মোড়ে-মোড়ে জন্ম নিক প্রহ্লাদের মতন সহস্র বীর, তাতে নিঃশেষ হয়ে যাবে ভারতবর্ষের অপরাধ-জগৎ। আবার ফিরে আসবে আগের সুদিন।"

হাততালির আড়ালে নয়ন ফিসফিস করে বলল, "এত ছেলের হাতে শায়েস্তা হবার মতন ক্রিমিনাল জুটবে তো রে ?"

ভূপতিবাবু হিস্ট্রির লোক। পেল্লাদের ঘটনাটাকে তিনি তুলনা করলেন আলেকজাণ্ডারের জীবনের একটি ঘটনার সঙ্গে, যেখানে আলেকজাণ্ডারের দুই শিষ্য তাঁর জীবন রক্ষা করে। ভূপতিবাবু পেল্লাদের মঙ্গল কামনা করে নিজের থেকে তাকে একটি একশো টাকার নোট উপহার দিলেন।

বৃদ্ধ বাচস্পতিমশাই তাঁর পরিপূর্ণ পক্ক বিশ্লেষণে যা বললেন, তা খুব সংক্ষিপ্ত হলেও শোনার মতন। "প্রহ্লাদেরা চিরকালই দুষ্টের দমন করেছে। হিরণ্যকশিপুর মতন রাজাও যার কাছে হার মেনেছিল, এই প্রহ্লাদ সেই প্রহ্লাদেরই অবতার বই তো নয়। দুটো ডাকাত ওর কী করবে?"

আর কোনও স্যার কিছু বললেন না। হেডস্যার বললেন, "ক্লাস টেনের সরিৎ প্রহ্লাদকে নিয়ে একটা কবিতা লিখেছে। সেটা দিয়েই এই সভা ভঙ্গ হোক।"

সরিৎদা একটু কাঁপা কাঁপা গলায় কবিতাটি পড়ল—

অসীম সাহসী তুমি প্রহ্লাদ,
তোমারে ঘিরি আজ আহ্লাদ
জীবন তুচ্ছ করে
বাঁচালে ভূপতি-স্যারে
শমন দমনে তুমি জল্লাদ।

প্রচুর হাততালির মধ্যে সভা ভঙ্গ হল। ইস্কুল কিন্তু ছুটি হল না, দুটো পিরিয়ড মাত্র কেটেছে। আমরা থার্ড পিরিয়ডে যে যার ক্লাসে চলে গেলাম।

ইস্কুল ছুটি হবার পর প্রহ্লাদ চুপি-চুপি আমাকে আর নয়নকে বলল, "চল, আমার সঙ্গে থানায় যাবি? বড়বাবু আজকে আমাকে যেতে বলেছে।"

আমরা একটু ভয় পেলেও রাজি হয়ে গেলাম।

থানাতে ঢুকতেই এক কনস্টেবল্ পেল্লাদকে এক পেল্লায় সেলাম ঠুকল। পেল্লাদ গটগট করে মিলিটারি কায়দায় বড়বাবুর ঘরে ঢুকে গেল। পেছনে-পেছনে আমরা। বড়বাবু খুব মনোযোগ দিয়ে একটা পকেটমারকে গুনে গুনে ওঠ-বোস করাচ্ছিলেন। আমরা ঢুকলাম দুশো পঁয়ত্রিশের মাথায়। প্রহ্লাদকে দেখেই বড়বাবু বলে উঠলেন, "আসুন, আসুন, প্রহ্লাদবাবু। হুকুম সিং, তিন কাপ চা লাও।" একজন কনস্টেবল্,

হুকুম সিং-ই হবে উঁকি দিয়েই চলে গেল। হুকুম তামিল করতেই বোধহয়।

পেল্লাদ বড়বাবুকে বলল, "এরা আমার বিশিষ্ট বন্ধু, এরা কালকের ডাকাত দুটোকে একবার থানার লক্-আপে দেখতে চায়।"

ডাকাত দুটোকে দেখে আমাদের পেল্লাদের ওপর সত্যি শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। ইয়া মুশকো জোয়ান, ইয়া গোঁফ-দাড়ি, লাল চোখ। দেখলেই ভয় করে। ডাকাত দুটো কিন্তু আমাদের দেখেই শিঁটিয়ে গেল। আমি পেল্লাদের মারের বহরটা দেখলাম। যে ডাকাতটার হাতে ভোজালি ছিল, তার দুই ভুরুর মাঝখানে একটা মাঝারি সাইজের কালো রঙের আলু। বাঁদিকের গোঁফের অর্ধেকটা নেই, ঠোঁটটা পটলের মতন ফুলে রয়েছে। অন্য ডাকাতটার অবস্থা এর চেয়ে কিছু ভাল নয়। নাকটা ফুলে ঝিঙের

মতন ঝুলে রয়েছে। আর কপালে কতকগুলো বড় সাইজের ডুমুর ইতস্তত ছড়ানো। দুটো ডাকাতের মুখ দেখে আমার একঝুড়ি আনাজের কথা মনে পড়ে ভীষণ হাসি পেয়ে গেল।

আমরা চায়ের সঙ্গে কিছু টা-এরও আশা করেছিলাম। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন কিছু এল না, তখন শুধু চা-ই খেলাম। বড়বাবু অনেক জ্ঞানের কথা বললেন এই ফাঁকে। লণ্ডনে নাকি ঠিক এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল দু বছর আগে, সব কিশোরেরই সাহসী হওয়া উচিত, ইত্যাদি।

হঠাৎ এ-পকেট সে-পকেট হাতড়াতে শুরু করলেন বড়বাবু। নিশ্চয়ই কিছু পড়ে গেছে। আমরা মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে খুঁজতে যাচ্ছিলাম, বড়বাবু বাধা দিয়ে বললেন, "না, না, মাটিতে পড়েনি, আমি আনতেই ভুলে গেছি। প্রহ্লাদবাবু, আপনার প্রাইজটা বরং আপনি কালকে এসে নিয়ে যাবেন।"

উঠে পড়লাম আমরা।

থানা থেকে বেরিয়ে আমরা প্রহ্লাদকে চেপে ধরলাম, "খাওয়াতেই হবে।"

"সে কী রে! তোরাই তো আমায় খাওয়াবি? বন্ধুগর্বে গর্বিত নোস্ তোরা, বল?"

"তা বটে। কিন্তু আমরা না থাকলে বন্ধুগর্বে গর্বিত কে হত বল? আজ যদি তুই এই গর্বিত আমাদের না খাওয়াস, তা হলে কাল আরেকটা বীরত্বের কীর্তি করলে কে বন্ধুগর্বে গর্বিত হবে বল? আমরাও তোকে খাওয়াব। পরের মাসে ভূপতিবাবু মাইনে নিয়ে বাড়ি ফিরুন না একবার। পরের মাসের গুণ্ডাগুলোকে আমরাই ধরব। হ্যাঁ, আমরাই।"

কথাগুলো পেল্লাদের মাথায় ঢুকল আর আমরা চট করে ঢুকে পড়লাম পাশেই জয়কালী রেস্তোরাঁয়। প্রাইজ-টাইজ পেয়ে পেল্লাদের মেজাজ একেবারে খুশ। নয়ন আর আমি পটাপট অর্ডার দিয়ে দিলাম, পেল্লাদ প্রতিবাদ করল না।

কাটলেটে কামড় দিলে যে বন্ধুত্ব কতগুণ বেড়ে যায়, তা হয়তো তোমাদের জানা নেই। মনে হয় বন্ধুত্বটা রসগোল্লার মতন মিষ্টি, আইসক্রিমের মতন ঠাণ্ডা, আর হজমির মতন উপকারী।

নয়ন আর আমি অনেকক্ষণ ধরে উশখুশ করছিলাম। নয়নই হঠাৎ ফশ করে জিজ্ঞেস করে বসল, "পেল্লাদ, তুই আমাদেরও বলবি না ঠিক কী হয়েছিল?"

পেল্লাদের একটু মনে লাগল, "কেন, খবরের কাগজে তো সবই পড়েছিস।"

আমরা বললাম, "তা পড়েছি বটে, কিন্তু তোকে তো আমরা বহুদিন চিনি।"

পেল্লাদ বলল, "বিশ্বাস না হয় তো বঙ্গশ্রী বস্ত্রালয়ের ওপরে যে ভদ্রমহিলা থাকেন, তাঁর কাছে চল। ব্যাপারটা উনি বারান্দা থেকে আগাগোড়া দেখেছেন। ভদ্রমহিলা এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে, তিনি ওপর থেকে একটা খুন্তি আর দুটো লুচি ছুঁড়ে মারেন ডাকাতগুলোকে। অবশ্য লাগেনি। মাথার অনেক ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেছে।"

আমরা কিন্তু নাছোড়। বললাম, "দ্যাখ, আমরা কাউকে বলব না। তিন সত্যি করছি।"

অনেক ধরাধরিতে বরফ একটু গলল। "কথা দিচ্ছিস, কাউকে বলবি না? দিব্যি কর।"

আমরা যত দেবতার নাম জানা ছিল, সবাইকার নামে দিব্যি খেলাম। যদি বলে ফেলি, তা হলে সামনের জন্মে যা-যা হব, তাও বললাম। সেগুলো দিয়ে একটা গোটা চিড়িয়াখানার সমস্ত খাঁচা ভর্তি হয়ে যায়।

পেল্লাদ অগত্যা বলতে রাজি হল। "কাল একটু তাড়াতাড়িই বাড়ি ফিরেছিলাম। ফিরেই দেখি, ছোট জামাইবাবু বসে আছেন। মা আমাকে আড়ালে ডেকে বলল, 'চট করে বাজার থেকে একটু মাছ আনতে পারিস?'

বাজারে গিয়ে চট করে একটা বেশ বড় সাইজের জ্যান্ত মাছ কিনে থলেয় ঢুকিয়ে বাড়ি ফিরছি। থলির মুখটা খামচে ধরে বাড়ির দিকে এগোচ্ছি, হঠাৎ দেখি, কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের এদিকের ফুটে ভূপতিবাবু কেমন ভ্যাবাচ্যাকা মেরে দাঁড়িয়ে আছেন। পেছন থেকে কাছে এগিয়ে গিয়ে 'কী হয়েছে স্যার' বলতে গিয়ে যেই একটু অন্যমনস্ক হয়েছি, ব্যস্, ব্যাগের ভেতর থেকে শোলমাছটা মারল সামনের দিকে এক বিশাল লাফ। তখন কি আর জানি যে, ভূপতিবাবুর সামনে ছুরি হাতে ডাকাত। আমিও সাড়ে ছাব্বিশ টাকার শোলমাছটা ধরতে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে এক পেল্লায় লাফ লাগালাম। ইংরেজিতে বলে লুক বিফোর ইউ লিপ, মানে লাফানোর আগে দেখবে। কিন্তু আমি দেখলাম, পরে। কী দেখলাম তোরা জানিস? শূন্যপথেই বুঝতে পারলাম, যা করে ফেলেছি, তা আর ফেরানো সম্ভব নয়। কিন্তু শোল মাছটার ভাই অব্যর্থ টিপ। একেবারে সপাটে ডাকাতটার দুই ভুরুর মাঝখানে। ওই আলুটা তো ওরই করা। লোকটা 'বাবা গো'র 'বা' বলেছে সবে, তার ভেতর আমি পড়েছি ওর ঘাড়ে। নিজেকে বাঁচানোর জন্য চালিয়েছি

এলোপাথাড়ি কিল, চড়, আঁচড়, কামড়। যখন জ্ঞান হল, দেখলাম একটা বিরাট জনতা আমায় ঘিরে নাচছে, আমি চড়ে আছি একটা মুশকোমতো

লুঙ্গি-পরা লোকের কাঁধে। ভূপতিবাবু একটা রোয়াকে বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন, আর আমার সামনে সেই ভদ্রমহিলা। সেই খুন্তি-ছোঁড়া ভদ্রমহিলা একটা প্লেট এগিয়ে ধরেছেন। প্লেটে লুচি, আলুর দম আর মিষ্টি। শোল মাছটা হারিয়ে গেছে কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে লোকের ভিড়ে।"

আমি বললাম, "তোরা এই খবরটায় এত মশগুল ছিলি যে, বাকি কাগজটা পড়িসই নি। এই দ্যাখ, এখানে তোর হারানো শোলমাছ সম্বন্ধেও একটা বিরাট খবর বেরিয়েছে।"

খবরটার ওপর ওরা হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

## একটি শোলমাছের অপমৃত্যু

কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে পয়লা ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় ট্রামের চাকার নিচে এক প্রবীণ শোলমাছের অপমৃত্যু ঘটে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যানবাহন-চলাচল বেশ কিছুক্ষণের জন্য বিঘ্নিত হয়। খবর পেয়ে দমকল-বাহিনী ও পুলিশ সেখানে হাজির হওয়াতে উন্মত্ত জনতার ট্রামটিকে জ্বালানোর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পুলিশ ও জনতার ভেতর ইষ্টক-বিনিময়ে কয়েকজন গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে বিশেষজ্ঞরা দ্রুত সেখানে উপস্থিত হন। তাঁদের মতে শোলমাছটি বাজার থেকে তিরিশ গজ হেঁটে এসেছে এবং রাস্তা পার হবার সময়েই এই দুর্ঘটনা ঘটে। বিশেষজ্ঞরা দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, শোলমাছটি বেঁচে থাকলে প্রাণী-জগতে এক নতুন নজির সৃষ্টি হত। কই জাতীয় মাছের হাঁটার দৃষ্টান্ত থাকলেও শোলমাছের এতদূর হাঁটার কোনও নজির নেই।

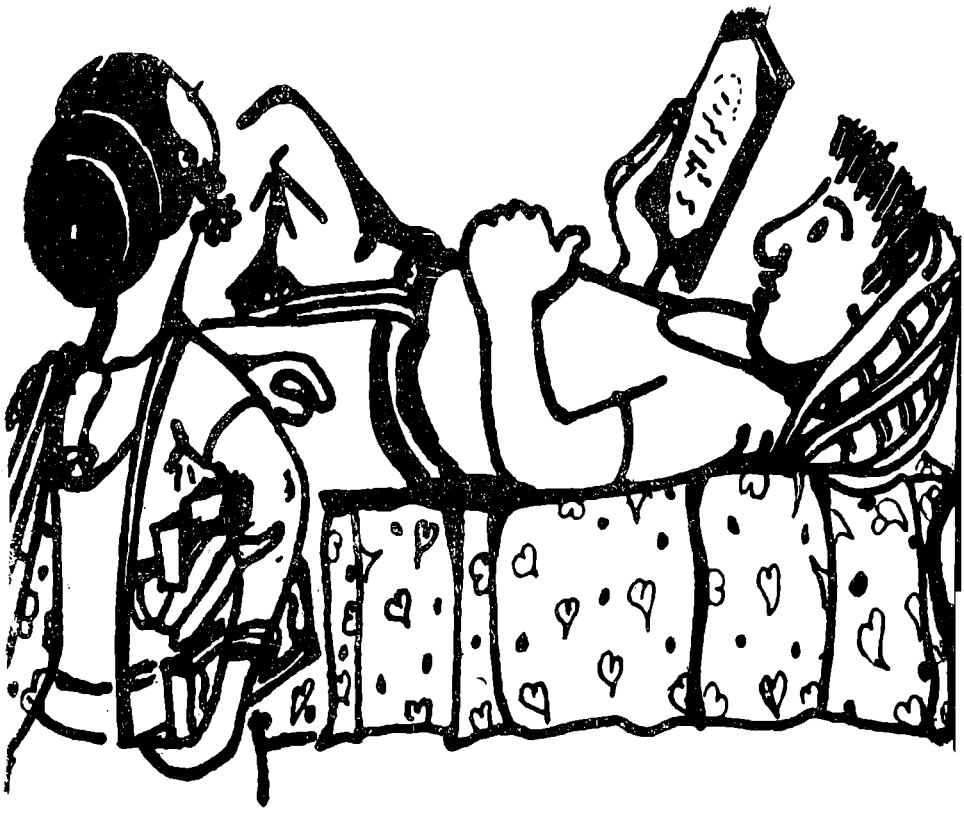

# কুক্কুটাসন

মন্দাকিনি নিউমার্কেট থেকে ফিরলেন পুজোর বাজার সেরে। ঘরে ঢুকেই দেখেন রামলাল পরম নিশ্চিন্তে পাখার নিচে বিছানায় শুয়ে হাত-পা ছড়িয়ে, খুব মন দিয়ে কি একটা বেশ মোটা বই পড়ছেন। মনোযোগ এমনই কঠোর যে মন্দাকিনির ঘরে ঢোকা টেরই পাননি। মন্দাকিনি জিজ্ঞেস করেন, "কি বই ওটা দেখি? নতুন কিনলে বুঝি?"

রামলাল বললেন, "না বৎসে, এই পুস্তক অতি কঠোর তত্ত্বের। আনাড়ীদের এই পুস্তকে অধিকার নাই।"

মন্দাকিনি ঝাঁঝিয়ে ওঠেন, "তুমি সর্বদা আনাড়ী আনাড়ী বলবে না বলে দিলাম হ্যাঁ। আর ও রকম বিশ্রী সাধু ভাষায় কথা বলছ কেন? দেখি না, বইটা কি?"

রামলাল বইটার ফাঁকে আঙুল দিয়ে বন্ধ করে বলেন, "আরে চটো কেন? আনাড়ী না, আনার-ই বলেছিলাম। মানে—ডালিমের মতন।

মন্দাকিনির কথার ঝাঁঝটা জুড়িয়ে আসে।

"নাও, আর রঙ্গ করতে হবে না। বলো না বইটা কি?"

রামলাল বললেন, "এই বইটা হল কঠোর হঠযোগের বই। এই সব হঠযোগ করে মুনি ঋষিরা সিদ্ধিলাভ করতেন। এ তোমার অঙ্কের যোগ বা আমেরিকানদের Jog নয়। এ হল খাস ভারতীয় যোগ, যাকে সাদা বাংলায় বলে ইণ্ডিয়ান ইয়োগা।"

মন্দাকিনি বললেন, "মাফ করবেন, ওটা ইংরাজীতে বলে। তা তোমার কি কাজে লাগবে এই হঠযোগ ?"

এরমধ্যে শ্যামলাল সন্ধ্যেবেলা বই খাতার সঙ্গে সই পাতাবার চেষ্টা শেষ করে এসে জুটেছে। সে মন দিয়ে দাদা-বৌদির কথা শুনছিল।

রামলাল তাচ্ছিল্যের হাসি হাসেন।

"কি কাজে না লাগবে বলতে পারো ? জানো, একবার যোগ সিদ্ধ হলে লোকে পারে না এমন কাজ নেই। দুশো-তিনশো বছর বাঁচতে পারে, ইচ্ছেমতো যে কোনো রূপ ধারণ করতে পারে। তোমার ইচ্ছে হল, তুমি মুহূর্তে এই এতটুকু বুড়ো আঙুলের মতো হয়ে গেলে। আবার ইচ্ছে হল···"

"বুড়ো আঙুলটাকে কলাগাছের মতো ফুলিয়ে নিলে আর সেই গাছে রাশি রাশি কদলী ফলল"—যুগিয়ে দেয় শ্যামলাল।

শ্যামলাল ইয়ার্কি করল কিনা রামলাল ঠিক ঠাহর করতে পারেন না। বলে চলেন—"কিন্তু বড়ই কঠোর জিনিস। অসাধারণ সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়।"

ভীমের হাঁক শোনা গেল রান্নাঘর থেকে, "বৌদি, শিগগীর এসো, উনুন কামাই যাচ্ছে।"

মন্দাকিনি বলেন, "ভালোই হল ঠাকুরপো। তোমার দাদার সিদ্ধিলাভ হলে আর রুটি হাতে করে গড়তে হবে না। আটার দিকে একবার কটমট করে তাকালেই আটা ভয়ে রুটি হয়ে যাবে।"

রামলালদের বড়মামা অর্থাৎ শকুনি মামা গতকাল এসেছেন, ক'দিন থাকবেন বলে। ভদ্রলোকের নাম শশাঙ্ককুমার নন্দী—তাই থেকে শকুনি। মামার বয়স বছর ষাটের কিছু বেশী, মাথা জোড়া টাক, দৃপ্ত ভুঁড়ি আর কানজোড়া হাসি এক মুহূর্তে বলে দেয় যে ভদ্রলোক একজন অমায়িক আড্ডাবাজ। গল্প বলায় শকুনি মামার জুড়ি মেলা ভার। সারা জীবন হরেক কাজে ভারত ও পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় জীবন কাটিয়ে এখন শেষ বয়সে তারকেশ্বরে স্থিতু হয়েছেন। জীবনের অভিজ্ঞতার কাঠামোর ওপর রংচং, ডালপালা লাগিয়ে যে গল্পগুলো

pathagar.net

পরিবেশন করেন, তার কিছু লঘুপাক, আর কিছু গুরুপাক ; তাতে হাসিই পাক আর কান্নাই পাক শকুনি মামার নো-পুরোয়া।

* * *

রাত্রে খাবার টেবিলে বসে মন্দাকিনি বললেন, "শুনেছেন মামাবাবু, আপনার বড় ভাগনে হঠযোগে সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করছেন।"

শকুনিমামা সব শুনে বললেন, "হঠযোগে পুরো সিদ্ধি হলে মানুষের অসাধ্য কিছুই থাকে না। তখন তিনি পাখির মতো উড়ন্ত শ্রেণী বা নারীর মতো ঝুলন্ত বেণী খুব সহজেই হতে পারেন কিন্তু যোগে আধ-সিদ্ধ হলেই সাংঘাতিক।"

শকুনিমামা বলে চললেন, "একবার শ্রীরামপুরে একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটেছিল। বাড়িশুদ্ধ সকলে নাইট শোতে সিনেমা গেছেন, কর্তা একা ছিলেন বাড়িতে। শোয়ের শেষে সকলে বাড়ি ফিরলেন কিন্তু কর্তা আর দরজা খোলেন না। অনেক হাঁকাহাঁকির পর কোনো সাড়া না পেয়ে দরজা ভেঙ্গে ঢুকে সকলে যা দেখলেন, তাতে চক্ষু স্থির।"

শ্যামলাল জিজ্ঞেস করল, "কি, যোগ করতে গিয়ে কর্তা বিয়োগ ?"

মন্দাকিনি বললেন, "না না, মনে হয় কর্তা পাখি হয়ে জানলা দিয়ে উড়ে গেছেন বা যোগবলে চিতা বাঘ সেজে বসে আছেন।"

শকুনিমামা বললেন, "কাছাকাছি গেছ। সবাই দেখল টেলিভিশনের সামনে কর্তা একটা বিকট মূর্তি ধরে উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। বাঁ পাটা ডান বগলের তলা দিয়ে গিয়ে ঘাড়ের ওপর তোলা। ডান পাটা বাঁ বগলের তলা দিয়ে ঠিক অমনি ভাবেই ঘাড়ের ওপর। হাত দুটো এ বগল সে বগল হয়ে দু' পা আর পাঁজরায় দুচার পাক খেয়ে কোথায় যে শেষ হয়েছে ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছে না।

"দীর্ঘশ্বাস আর চাপা কান্নার ডালি নিয়ে সকলে ধীর পায়ে কাছে গিয়ে কর্তার কিম্ভূতাকার দেহটা চিত করে দেখলেন মুখটা বিকৃত। অনেকটা গলায় ফাঁস দিলে যে রকম হয়, সেরকম। নাকের ফুটোগুলো ফুলে এত্তবড় হয়েছে যেন ফেটে যাবে আর চোখ দুটি…"

শ্যামলাল বলল, "উল্টে গেছে !"

মামা বললেন, "না, পিটপিট করছেন।"

এক মুহূর্তে আনন্দের ফোয়ারা ছুটল। কর্তা বেঁচে আছেন। কারুর আর ব্যাপারটা বুঝতে বাকি রইল না। সন্ধ্যেবেলায় টি. ভি-তে মহারাজ লম্বানন্দর হঠযোগের ক্লাস ছিল। কর্তা এই হঠযোগেই ঘটের

আকার ধারণ করেছেন। হুলুস্থুল পড়ে গেল। ছোটছেলে ডাক্তার আনতে ছুটল। মেজো ছেলে কবরেজ, বড় ছেলে ওঝা। আর সেজো ছেলে গাড়ি নিয়ে দৌড়ল টি. ভি স্টেশনে। লম্বানন্দর ঠিকানা জোগাড় করে তাকে পাকড়ে আনতে হবে। ছোট বৌ দৌড়ল কালোজিরে ভাজতে। বলল, "আমার সোদপুরের দা মশাইয়ের এমনটিই হয়েছিল। ভাজা কালোজিরে শোঁকাতে তবে সারলো।"

বড় আর মেজ বৌ-এর বাড়িতেও কাদের যেন এমনটিই হয়েছিল। তারা দৌড়ল হিঙে শাক বাটতে আর ছাতুর পুলটিস তৈরী করতে। বেচারা সেজ বৌ। তার বাড়িতে কার যে এমনটি হয়েছিল কেউ জানতে পারল না। কারণ সে ক'দিন হল বাপের বাড়ি গেছে। ভদ্রলোকের স্ত্রী এককোণে বসে ইষ্টনাম জপতে লাগলেন।

ডাক্তার এসে স্টেথো দিয়ে পরীক্ষা করে খুব দুঃখের সঙ্গে বললেন, "অনেক চেষ্টা করে উঁকি দিয়েও জিভ দেখতে পেলাম না। বুকে পিঠে

স্টেথো লাগানো গেল না। যাই হোক্, ওষুধ দিচ্ছি—এই বড়িটা দিনে দুটো করে তিনবার আর এটা তিনটে করে দু'বার। এরকম তিনদিন চলুক। ইউরিন, ব্লাড টেস্ট আর চেস্টের এক্স-রে করিয়ে কাল চেম্বারে রিপোর্ট করবেন। একজন স্পেশালিস্টের সঙ্গে কনসাল্ট করতে পারলে ভালো হত; কিন্তু এটা ঠিক কার আওতায় পড়বে বুঝতে পারছি না। একটু ভাবি।"

ততক্ষণে কবিরাজ আর ওঝারাজ এসে গেছেন। ওঝারাজ চটপট একটা ঝাঁটা আর কিছু শর্ষে নিয়ে ঘরের কোণে একটা ছোট আগুন জেবলে প্রচণ্ড চিৎকার করতে লেগে গেলেন। ঘর ধোঁয়ায় ভরে উঠল। থেকে থেকে একেক মুঠো শর্ষে কর্তার গায়ে ছুঁড়ে মারতে থাকলেন আর কর্তা শিউরে শিউরে উঠতে লাগলেন।

কবিরাজ সব দেখে শুনে বললেন, "এক্ষুণি একটা বড় বালতি আর আধ সের টক দই আনিয়ে দিন। আমি মকরধ্বজ এনেছি। মধু-মকরধ্বজ দধি সহযোগে স্নান করালেই সুস্থ হয়ে উঠবেন।"

খুব কম সময়ে দই এসে গেল। মকরধ্বজ ও মধু একসঙ্গে গোলাও হল বালতিতে। বালতি থেকে ঘটি করে কবিরাজ কর্তার গায়ে ঢালতে যাবেন, এমন সময় একটি বাজখাঁই হুংকার শোনা গেল।

"এ···ই সব চো···প্।"

মুহূর্তে সকলের চোখ ঘুরে গেল দরজার দিকে। সেজ ছেলে হাবুলের পাশে দাঁড়িয়ে যিনি হুংকারটি ছেড়েছেন তিনিই যে মহারাজ শ্রীলম্বানন্দ, এ ব্যাপারে কারো সন্দেহের অবকাশ রইল না। একমুখ গোঁফ দাড়ি, মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা, চওড়া কপাল, তার নিচে জ্বলন্ত দুটি চোখ। সাড়ে ছ' ফিট উঁচু একহারা তালপ্রাংশু চেহারা নামের সার্থকতার সাক্ষী দিচ্ছে।

একটি 'চোপ্'-এ ঘরের শান্তি ফিরে এসেছে। সকলে প্রায় হিপ্-নোটাইজড্। ওঝারাজ বন্ধ করেছেন শর্ষে ছোঁড়া, আর কবিরাজের হাতের ঘটি একইভাবে হাতে থেকে গেছে।

শ্রীলম্বানন্দ এগিয়ে গেলেন কবিরাজের দিকে। বালতিটি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কি?" কবিরাজের বর্ণনা শুনে শ্রীলম্বানন্দ সেই রাগী, বাজখাঁই গলায় বললেন, "ওটা আমার হাতে দিন।" কবিরাজের হাত থেকে ঘটিটা ঝটিতে কেড়ে নিয়ে হেঁচকা টানে মাথার ওপর তুললেন। অনেকেই রক্তারক্তির ভয়ে চোখ বুজলো।

শামলাল জিজ্ঞেস করল, "কি! ছুঁড়ে মারলেন? না, ধাঁই করে এক ঘা?"

মামা বললেন, "না! লম্বানন্দ ঢকঢক করে ঘটিটি ফাঁক করে বললেন, 'বড়ো তেষ্টা পেয়েছিল'। বলেই বালতি থেকে আরেক ঘটি তুলে নিলেন।"

মন্দাকিনি বললেন, "যোগীর তেষ্টা, এক ঘটিতে কি হবে? এরকম করে কি পুরো বালতিটাই সাবড়ে দিলেন?"

মামা বললেন, "না। শ্রীলম্বানন্দ দ্বিতীয় ঘটিটা নিয়ে সোজা ওঝা-রাজের আগুনে ঢেলে দিলেন। আগুন গেল নিভে। ওঝারাজ ককিয়ে উঠলেন, এক্ষুনি বিদেহী আত্মা দাঁতে করে বালতি নিয়ে চলে যেত আর আপনি…"

শ্রীলম্বানন্দ হুঙ্কার ছাড়লেন, "চো…প্।"

শ্রীলম্বানন্দ এগিয়ে এলেন কর্তার দিকে। বললেন, "ত্রিবন্ধাসনে এ রকমই হবার কথা। ত্রি-বন্ধ মানে তিনটি অঙ্গ বন্দী হয়ে পড়ে, হাত, পা আর মুখ। একেবারে নাড়ানো যায় না। এতে শারীরিক কোনো ক্ষতি হয় না। কিন্তু আমি তো টি. ভি.-তে এটি খোলার উপায়ও দেখিয়ে দিলাম, তাহলে…"

কেউ কেউ বললে, "ত্রি-বন্ধাসন করেই হয়তো মুখ থুবড়ে পড়ে গেছেন; টি. ভি-তে খোলার উপায়টা দেখতে পান নি মোটে।"

বড়ো ছেলে কাবুল হাত জোড় করে বলল, "দয়া করে তাড়াতাড়ি খুলে দিন স্যার, নইলে ত্রি-বন্ধাসন হয়তো প্রাণনাশন করবে।"

শ্রীলম্বানন্দ একটু হেসে কর্তাকে মাথা উঁচু করে তুলে ধরলেন, তারপর বাঁ কাঁধ আর পায়ের মধ্যে তাঁর বাঁ হাতটি দিয়ে একটু চাড় দিলেন। তার পরক্ষণেই কর্তার পিঠে এক বিরাশী সিক্কার চাপড়।

সকলে 'হায় হায়' করে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই ম্যাজিকের মতো কর্তা সটান খাড়া হয়ে ছোট ছেলেকে গাল পাড়তে শুরু করেছেন, হতভাগা টাবলেটার যদি কোনো বুদ্ধি হয়ে থাকে। সামনে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিলি, বাপ যে কতক্ষণ সিগারেট খায়নি সে হুঁশই নেই। পারলি না বুদ্ধি করে মুখে একটা সিগারেট গুঁজে ধরিয়ে দিতে। দাও গিন্নি, প্যাকেটটা দাও।"

কবিরাজ সব দেখে শুনে থ। জিজ্ঞেস করলেন, "প্রভু, এই শেষ আসনটার নাম যদি বলেন?"

মহারাজ শ্রীলম্বানন্দ একটু হেসে হাবুলকে বললেন, "অনেক রাত হল, চল ফেরা যাক্।" শ্রীলম্বানন্দ বেরিয়ে গেলেন।

ওঝারাজ বললেন, "আমি এক সময় কিছু কিছু যোগ শিখেছিলাম ওটা হল সম্পূর্ণ চপেটাসন।"

শকুনিমামা গল্প শেষ করে বললেন, "বুঝলে তো হঠযোগে আধসিদ্ধ হওয়ার বিপদ!"

রামলালের মুখ দেখে বুঝেছেন কিনা ঠিক বোঝা গেল না। গুম হয়ে রইলেন।

* * *

পরদিন সকালে মন্দাকিনি শ্যামলালকে বললেন, "তোমার দাদা আজ ভোর চারটেয় উঠেই পাশের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর ও-ঘর থেকে খুটখাট, ধুপধাপ, চুপচাপ, হিসহাস সব ধরনের আওয়াজ আসতে থাকল। আমি তো ভয়ে কাঁটা হয়েছিলাম। যদি শ্রীরামপুরের কর্তার মতো অবস্থা হয়! তারপর দেখলাম না, তা হয় নি…", রামলালকে আসতে দেখে মন্দাকিনি থামলেন।

প্রাতরাশ খাবার সময় রামলাল ডিমের ওমলেট সরিয়ে দিয়ে বললেন, "আজ থেকে আমি মাছ-মাংস-ডিম ছেড়ে দিলাম।"

শকুনিমামা বললেন, "হ্যাঁ, যোগসিদ্ধির জন্য ওসব ত্যাগ করতে হয় বৈকি!"

রামলাল বুঝিয়ে দেন, "ওসব আসলে বিড়াল, কুকুর, শৃগালের খাদ্য। ঘেরণ্ড সংহিতা বা হঠযোগ প্রদীপিকা পড়লেই জানতে পারবেন।"

মন্দাকিনি বললেন, "কি যা তা বলছ! শরীর খারাপ হয়ে যাবে যে!"

শ্যামলাল বলল, "কেন বেকার ঝামেলায় জড়াচ্ছ দাদা, দু'দিন পরেই খেতে ইচ্ছে করবে, তখন আর প্রেস্টিজের খাতিরে খেতে পারবে না।"

রামলাল মন্দাকিনিকে বললেন, "আমার জন্য নিরামিষ ব্যবস্থা করবে।" বলেই উঠে গেলেন।

কাজ থেকে ফেরার পর রামলালকে দেখা গেল, পাখার নিচে বিছানায় চিৎপাত হয়ে সেই মোটা বইটা গিলছেন, তার পরেই পাশের ঘরের দরজা বন্ধ আর রকমারি শব্দ।

pathagar.net

শকুনিমামা বললেন, "সাধনার সান্ধ্যভাগ। হয়তো কুক্কুটাসন করছে। ওটা খাবার টেবিলে করলেই তো হত।"

রামলাল সকলের অনেক আগে খেয়ে শুয়ে পড়লেন। বোধহয় ভোর চারটেয় উঠবার জন্য।

এই একই রুটিনে যখন এক সপ্তাহ কেটে গেল বাড়ির সকলে বুঝল যে ব্যাপারটা প্রথমে যত সহজ ভাবা গিয়েছিল তত সহজ নয়।

ভীম পর্যন্ত বলল, "বৌদি, একটা উপায় না বার করলে তো বড় মুশকিল। দাদাবাবু যে শুকিয়ে শেষ হয়ে যাবে।"

শকুনিমামা বললেন, "আর কটা দিন থেকেই যাই। এই বিপদে তোমাদের ফেলে তো আর যেতে পারি না।"

শ্যামলাল বলল, "বৌদি, দেখেছ, আজ বিকেলে দাদা হাতে ভগবদ্ গীতা নিয়ে পায়চারি করছিল।"

মন্দাকিনি আঁতকে ওঠেন, "কি সর্বনাশ! তোমার দাদা কি সন্ন্যাসী হবার প্ল্যান করছে নাকি? জিজ্ঞেস করলে তো মুখে রা কাড়ে না!"

* * *

রামলালের হঠযোগ সাধনা ও ভগবৎ প্রেম যত উথলোতে লাগল, তাঁর পার্থিব জগতের প্রতি স্পৃহা যথারীতি ততই কমতে শুরু করল। কাজ কম্মে মন নেই, বাড়ি থেকে বেরুনো-ঢোকার ঠিক নেই।

একদিন অনেক রাত হয়ে গেল। রামলাল আর বাড়ি ফেরেন না। মন্দাকিনি ঠায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে, শকুনিমামা প্রায় আধ ঘণ্টা হল অন্য-মনস্ক হয়ে দাঁত খুঁচিয়েই চলেছেন, শ্যামলাল গল্পের বইয়ের একটা পাতায় দাঁড়িয়ে আছে পনেরো মিনিট, আর ভীম রামলালকে খুঁজতে গেছে শ্রীকান্তবাবুর বাড়ি।

যখন রাত সাড়ে এগারোটা বেজে গেল, শকুনিমামা বললেন, "আর তো অপেক্ষা করা যায় না। পুলিশে আর হাসপাতালে খবর নিতেই হয়।" শ্যামলাল পড়ল ফোন নিয়ে।

রাতের দিকে কলকাতার টেলিফোনের অবস্থা কিঞ্চিৎ ভালো হয়, শ্যামলাল ঝটপট অনেকগুলো থানার লাইন পেয়ে গেল। কাছে-পিঠে কতকগুলো থানা বলল, ওই নামের কোনো লোক ধরা পড়েনি। জোড়াবাগান থানা থেকে ও. সি. বললেন, "হ্যাঁ, ওই নামের একজনকে ধরা হয়েছে। অপরাধটা এখনো সঠিক বোঝা যায়নি। লোকটা মনে হয় চোরাই আফিম চালানের সঙ্গে জড়িত। আপনি কিছু ভাববেন না স্যার। এক্ষুণি আমরা টাঙিয়ে ঠেঙাবো, তখন বেটা ঠিক কবুল করবে। আমি কাল লালবাজারে আপনার সঙ্গে দেখা করব। একটু দরকার আছে স্যার!"

শ্যামলাল বলল, "কি কেলেঙ্কারী কাণ্ড বুঝেছ! দাদাকে ধরেছে আফিমের চোরা চালানের দায়ে।"

শকুনিমামা বললেন, "আর এক্ষুণি যদি না ছাড়ানো যায়, তাহলেই কেস করে দেবে। তখন ছাড়াতে কোর্ট ঘর করতে হবে। সেবার দার্জিলিঙে ঠিক এরকম হয়েছিল…"

শ্যামলাল ঝাঁঝিয়ে উঠল, "আপনি থামবেন?"

শকুনিমামার গল্প অঙ্কুরেই বিনাশ হওয়াতে উনি কিন্তু চটলেন না, শ্যামলালকেই সাপোর্ট করলেন, "ঠিকই তো। এটা কি গল্প বলার একটা সময় হল?"

মন্দাকিনি প্রায় ধরা ধরা গলায় বললেন, "কি হবে গো ঠাকুরপো? তোমার দাদাকে কি ওরা সত্যিই ঠেঙাবে না কি?"

শ্যামলাল বলল, "তুমি অত নার্ভাস হয়ো না তো, একটু ভাবতে দাও।"

মন্দাকিনি বললেন, "হ্যাঁ, তুমি ভাবো, আর ওদিকে ওরা তোমার দাদাকে এতক্ষণে টাঙিয়ে দিয়েছে।"

হঠাৎ "পেয়ে গেছি বৌদি" বলে শ্যামলাল দৌড়ল টেলিফোনের দিকে।

"হ্যালো, জোড়াবাগান থানা? ও. সি-কে দিন।"

ও. সি. বললেন, "বুঝতে পেরেছি স্যার। গলা শুনেই চিনতে পেরেছি। বলুন কি করতে হবে।"

"শুনুন, আমাদের কাছে এক্ষুণি খবর এসেছে যে রামলাল বলে যে

লোকটিকে ধরেছেন, সে ওসব আফিমের মামলায় নেই। ও একজন সৎ ব্যবসায়ী।"

"ঠিকই খবর পেয়েছেন স্যার। লোকটিও বহুবার ওই একই কথা বলছিল। আমারও তাই মনে হয়েছিল স্যার। লোকটা সৎ ব্যবসায়ী না হয়ে যায় না। কিন্তু কি বলব স্যার, এই নতুন সাব-ইন্সপেক্টরগুলো এতো ফাজিল হয়েছে যে কোনো কথাই শুনতে চায় না। এক্সপিরিয়েন্স নেই তো, তাই আফিমের চোরা কারবারী আর সৎ ব্যবসায়ীর মধ্যে পার্থক্য বোঝে না।"

"লোকটাকে কি টাঙানো হয়েছে?"

"না স্যার। সবে হাতে দড়ি বেঁধেছে।"

"ওকে এই মুহূর্তে খালাস করে দিন।"

"এই মুহূর্তেই দিচ্ছি স্যার। তিওয়ারী, ওই লোকটাকে আভি খালাস কর দেও। আমি স্যার কাল সকালে আপনার সঙ্গে লালবাজারে দেখা করব / একটু দরকার আছে।"

শ্যামলাল ফোন নামিয়ে রেখে বলল, "যাক্, আর চিন্তা নেই, দাদা এখুনি এসে পড়বে।"

শ্যামলালের কথা শেষ হবার আগেই দরজায় বেল বেজে উঠল। দরজা খুলতেই প্রবেশ করলেন রামলাল।

মন্দাকিনি, শ্যামলাল আর শকুনিমামা একসাথে চেঁচিয়ে উঠলেন, "এতো তাড়াতাড়ি এসে গেলে।"

রামলালের গলায় অভিমান, "কেন? সাড়ে বারোটা কি যথেষ্ট রাত নয়?

শকুনিমামা বললেন, "না, মানে এই তো তোমাকে ছাড়ার হুকুম দেওয়া হল। তাই আর কি।"

রামলাল বললেন, "কি যা তা বলছ! ছাড়ার হুকুম মানে? আর আমাকে ছাড়ার হুকুম কে দেবে? আমি নিমতলা শ্মশানে এক সাধু-বাবার সঙ্গে বসে ছিলাম। আশেপাশে অনেকেই গাঁজা টাজা খাচ্ছিল। তোমরাও কি এখানে ওইসব চালাচ্ছিলে?"

মুহূর্তে ব্যাপার জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। সমস্ত কথা শুনে রামলাল একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কপালে হাত ছুঁইয়ে বললেন, "সবই তাঁর ইচ্ছা। আরেক রামলাল যে ছাড়া পেল সেও তাঁরই ইচ্ছে। শ্যামলাল নিমিত্ত মাত্র।"

pathagar.net

শকুনিমামা বললেন, "হ্যাঁ ধরা পড়েছিল, সেও তাঁরই ইচ্ছা।"

রামলাল বললেন, "ঠিক তাই।"

শ্যামলাল বলল, "তাঁর ইচ্ছে করে ধরাবার, তারপর ইচ্ছে করে ছাড়াবার কি কোনো প্রয়োজন ছিল ?"

রামলাল বললেন, "ওই তো তাঁর মহিমা।"

মন্দাকিনি এতক্ষণ গোঁজ হয়ে বসেছিলেন। হঠাৎ ক্ষেপে উঠলেন, "ওসব মহিমা ফহিমা বুঝি না। তুমি যদি এইসব পাগলামো না ছাড়ো তো কাল থেকে আমি অনশন করব।"

রামলাল ঠাণ্ডা গলায় বললেন, "তিনি চাইলে তুমি হাজার না চাইলেও তোমাকে অনশন করতেই হবে। আর তিনি যদি না চান, তুমি হাজার চাইলেও অনশন করতে পারবে না।"

মন্দাকিনি চুপসে যান।

ভীম এরমধ্যে খাবার গুছিয়ে ডাক পেড়েছে। সকলে খেতে বসল। কারুর মুখে কথা নেই। রাত অনেক হয়েছে। ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। শকুনিমামা তো অনেকক্ষণ থেকেই ঢুলছিলেন। সে রাতে আর কেউ কোন কথা বললেন না।

pathagar.net

# আরোগ্যাসন

দিনগুলো যেন আর কাটতেই চায় না। বাড়ির আবহাওয়াটা ক্রমশ থমথমে হয়ে উঠেছে। যে বাড়ি সর্বদা হাসির রোদ আর আনন্দের হাওয়ায় চঞ্চল হয়ে থাকত কোথা থেকে একটা কালো মেঘ যেন উড়ে এসে তার গলা টিপে ধরতে চাইছে। স্বস্তিতে দম ফেলার ফুরসত দিচ্ছে না একটুও। রামলাল কারবারে বেরোনো প্রায় বন্ধ করেছেন বললেই হয়। কখনো-সখনো খুব জরুরী দরকারে দু-এক ঘণ্টার জন্য যান, কাজ সেরেই ফিরে আসেন। জিজ্ঞেস করলে বলেন, "আর ওসব বিষয়-আশয় ভাল লাগছে না।"

মন্দাকিনির সেই সদা-প্রাণচঞ্চল, উচ্ছল ভাব লুকিয়েছে তাঁর চোখের কালির অন্তরালে। শ্যামলালের মুখ দেখলে বোঝা যায় গভীর চিন্তা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। শকুনিমামার মেজাজটাও ভীষণ খিঁচড়ে আছে।

আবহাওয়াটাকে হালকা করার জন্য তিনি দু-একটা গল্প বলার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু না জমেছে গল্প, না কেটেছে গুমোট।

সেদিন সকালে মন্দাকিনি শ্যামলালকে ডেকে বললেন, "তোমার দাদা কাল রাত্রে বলছিল হরিদ্বার চলে যাবে। ওখানেই একটা বাড়ি কিনে থাকবে।"

শ্যামলাল বলল, "আর ব্যবসার কি হবে?"

মন্দাকিনি দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন, "বলছে ব্যবসা-ট্যাবসা তোমার আর আমার নামে আধাআধি লিখে দেবে। দোহাই ঠাকুরপো, যা হয় একটা উপায় বার কর, না হলে তো সবাই মারা পড়ব।"

শ্যামলাল বলে, "তোমার থেকে আমার চিন্তা কি কিছু কম বৌদি? তুমি জানো, ব্যবসা প্রায় লাটে ওঠার অবস্থা? আমি অনেক ভেবেছি কিন্তু কিছুই মাথায় আসছে না।"

শকুনিমামা সব শুনছিলেন। বললেন, "আমিও অনেক ভেবে দেখলুম আমারও শ্যামলার অবস্থা।"

সেদিন রাতে খাবার সময় শকুনিমামা বললেন, "একটা বইয়ে পড়েছিলাম যে হঠযোগ ঠিক ঠিক অভ্যেস করলে যে আসনে যোগী সিদ্ধি লাভ করেন, সেই আসনের সমস্ত রূপ, গুণ এমনকি দোষগুলো পর্যন্ত যোগীর ওপর বর্তায়। ব্যাপারটা আর একটু বুঝিয়ে বলা দরকার, ধরো একজন ব্যাঘ্রাসনে সিদ্ধিলাভ করল। সে হয়ে উঠবে বাঘের মতো সাহসী, পরাক্রমশালী। এমনকি তার গায়ে ডোরা আর পেছনে লেজ দেখা দিলেও আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।"

রামলাল সায় দিলেন, "এটা আমিও পড়েছি। সাধনায় সিদ্ধিলাভ হলে সবই হতে পারে।"

শকুনিমামা বললেন, "শুধু হতে পারে তাই নয়, এরকম প্রায়ই হয়ে থাকে। লোকে বলে, চিড়িয়াখানায় যে সাড়ে তিনশ' বছরের বুড়ো কচ্ছপটা আছে ওটা নাকি এক নবাবের রাজসভার এক পণ্ডিত, মন্ত্রণাদাতা। ভদ্রলোক একনিষ্ঠভাবে পূর্ণ কূর্মাসন অভ্যাস করতেন। ওমা, কিছুদিন পরে দেখা গেল ভদ্রলোকের পিঠটি শক্ত আর ঢিবিপানা হয়ে উঠছে। উনি শাকপাতা ছাড়া আর কিছুই খেতে পারেন না। ক্রমে দেখা গেল পণ্ডিতের পা-গুলো ফুলে উঠেছে, মুখটা সরু হয়ে আসছে, ঘণ্টায় চারফুটের বেশী হাঁটতে পারেন না। কারুর আর বুঝতে বাকি রইল না যে পণ্ডিত ধীরে ধীরে একটি বিরাট কূর্মে অর্থাৎ কচ্ছপে

pathagar.net

পরিণত হয়েছেন। পণ্ডিত রাজসভা ছেড়ে বাগানে স্থান পেয়ে তো মহাখুশি। আর নবাবকে নীরস মন্ত্রণা দিতে হয় না। হারেমের সরস ললনারা তাঁর পিঠে চেপে কলকল খলখল শব্দে জলকেলি, স্থলকেলি করে বেড়ান। ইংরেজরা যখন নবাবের সব ঐশ্বর্য কেড়ে নিল, তখনই তারা পণ্ডিতকে এনে ভরে দিল আলিপুর চিড়িয়াখানায়। পণ্ডিত হিংয়ের কচুরি খেতে বড়ো ভালবাতেন। এখনও চিড়িয়াখানায় দেখবে পণ্ডিতের জন্মদিনে তাঁর বংশধরেরা তাঁকে হিংয়ের কচুরি খাইয়ে যায়।"

শকুনিমামা জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা রামলাল, তুমি কি কুক্কুটাসন কর ?"

রামলাল বললেন, "হ্যাঁ, কেন বলুন তো ?"

শকুনিমামা বললেন, "না, কিছু না, এমনি জিজ্ঞেস করলুম।"

* * * *

পরের দিন সকালবেলা রামলাল খাবার টেবিলের দিকে আসতে আসতে শুনলেন, শ্যামলাল চাপাগলায় মন্দাকিনিকে বলছে, "দাদার মুখটা কেমন যেন ছুঁচোলো লাগছে না ? মুরগির মতো ?"

মন্দাকিনি বলছিলেন, "কি জানি ভাই, আমারও তো সেইরকমই লাগছে……"

হঠাৎ রামলালকে আসতে দেখে ঝপ্ করে কথা থামিয়ে দিলেন।

রামলাল মন্দাকিনিকে জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু বলছিলে কি ?"

মন্দাকিনি গম্ভীর গলায় বললেন, "তুমি কি আর বলার কিছু রেখেছ ? আজ কি কাজে বেরুবে না ?"

রামলাল মুখে বললেন, "না।" মনে মনে বললেন, "আমার কানকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ না।" প্রাতরাশ সেরে রামলাল সোজা চলে গেলেন ড্রেসিং টেবিলের সামনে। তিন পাল্লার আয়নায় নিজেকে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করলেন। এপাশ, ওপাশ, সেপাশ থেকে। কুক্কুটাসন রামলাল সত্যিই করেন। বেশ অনেকক্ষণ ধরেই করেন। এর গুণাবলী অনেক। মনকে সংযত করতে এর জুড়ি নেই। কুক্কুটের দিক থেকে মন টেনে আধ্যাত্মিক লাইনে ঘুরিয়ে দিতে পারে বলেই বোধহয় ওই নাম। কুক্কুটাসনের গুণ যত বেশী, করা কিন্তু তত শক্ত নয়। পদ্মাসনে বসে হাত দুটো পায়ের ফাঁক দিয়ে সুড়ুৎ করে গলিয়ে দাও, তারপর হাতে ভর দিয়ে পদ্মাসন করা

শরীরটা জমি থেকে তুলে ধরো। ব্যস্, কুক্কুটাসন কমপ্লিট, এবার মুরগির মতো হেঁটে বেড়াতে পারো।

মুখটা কি ছুঁচোলো দেখাচ্ছে? মুশকিলে পড়েন রামলাল। ছুঁচ থেকে ছুঁচোলো না ছুঁচো থেকে ছুঁচোলো? ডিক্সনারী না দেখে বলা সম্ভব নয়। তার ওপর শ্যামলা বলছিল, "ছুঁচোলো দেখাচ্ছে মুরগির মতো।" মুখটা ছুঁচোলো দেখালে কোন্‌টার সাথে মিল হবে রে বাবা!! ছুঁচ, ছুঁচো আর মুরগি—তিনটে তিন রকম দেখতে। তিনটের সাথেই কি আলাদা করে মিল থাকবে?

মিলগুলো তো মিলেমিশেও হতে পারে; যেমন কমবেশী করে কিছুটা ছুঁচ, কিছুটা ছুঁচো আর কিছুটা মুরগি। আর ভাবতে পারেন না রামলাল। মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে। নাঃ, মুখটা ছুঁচোলো হয়েছে কিনা বোঝা তাঁর কম্মো নয়। রামলাল শুধু এইটুকুই বোঝেন যে আগের সঙ্গে খুব একটা পরিবর্তন তাঁর নজরে ধরা পড়ছে না। খালি ওপরের ঠোঁটটা একটু সামনের দিকে বার করা মনে হচ্ছে।

* * *

রাত্রে খাবার সময় শকুনিমামা রামলালকে বললেন, "যাক্, তোমার আর সিদ্ধিলাভের খুব দেরী আছে বলে মনে হচ্ছে না।"

রামলাল জিজ্ঞেস করলেন "কি করে বুঝলেন?"

শকুনিমামা বললেন, "এই দেখেশুনে মনে হচ্ছে আর কি! তা তুমি হরিদ্বার যাচ্ছ কবে?"

রামলাল কিছু না বলে, গুম হয়ে রইলেন।

পরের দিন সকালে দাঁড়ি কামানোর সময় রামলাল শুনতে পেলেন, মন্দাকিনি চাপা ধরা গলায় বলছেন, "ঈশ্বরকে ডাকা ছাড়া কোনো রাস্তা নেই, বুঝলে ঠাকুরপো, কাল সারারাত তোমার দাদা নাক ডাকার বদলে খুব আস্তে আস্তে কোঁকর কোঁ কোঁকর কোঁ করেছেন। আমি সারারাত প্রায় ঘুমোইনি। একবার ভাবলাম জাগিয়ে দিই, কিন্তু মনে হল লাভ নেই। নিজের নাক ডাকাই কেউ জেগে উঠে বুঝতে পারে না, তায় মুরগি ডাকা। এমন করে সারারাত কাটল, ভোর চারটের সময় তোমার দাদা খুব জোরসে তিনবার কোঁকর কোঁ, কোঁকর কোঁ করে উঠে যোগ করতে চলে গেলেন।"

মন্দাকিনি এসে রামলালকে জিজ্ঞেস করলেন, "আজ কাজে বেরুবে?"

রামলাল বললেন, "হ্যাঁ।"

মহা ফাঁপরে পড়লেন রামলাল। সত্যিই তো, নিজের নাক ডাকা কখনো তো শুনতে পাননি। ঘুমের ঘোরে যদি মুরগি ডাকেন, তাহলেও তো শুনতে পাবেন না, দিন দিন হয়তো মুরগির ডাক বাড়তেই থাকবে।

গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে ড্রাইভার রতনলাল রামলালের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু ফিক্ করে হেসে ফেলল।

রামলাল জিজ্ঞেস করলেন, "কিরে, হাসছিস যে?"

রতনলাল গম্ভীর হয়ে যায়। "কই, হাসিনি তো স্যার।"

কিন্তু রামলাল স্পষ্ট দেখেছেন ও হেসেছে।

অফিসে ঢুকে রামলাল কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা চলে গেলেন নিজের বসার জায়গায়। ছোট অফিস রামলালের। প্রয়োজনের বেশী নয়। সব মিলিয়ে জনা দশেক লোক। একটা কাঠের পার্টিশন আছে। তার একদিকে বসেন রামলাল নিজে। কখনও কখনও দরকার পড়লে শ্যামলাল এসে বসারও একটা জায়গা আছে। পার্টিশনের ওদিকটায় বসে অন্য সকলে। টাইপিস্ট, ক্লার্ক, বেয়ারা ইত্যাদি।

রামলাল বসেই শুনতে পেলেন পার্টিশনের ওপার থেকে চাপা কণ্ঠস্বর।

একজন বলল, "সাহেবের ঘাড়ের কাছের লোমগুলো আর লোম নেই। দেখেছিস্, দিব্যি রোঁয়ার মতো হয়ে উঠেছে। কদিন বাদেই পরিষ্কার পালক হয়ে উঠবে।"

আরেকজন প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, সপ্তাহে কটা করে ডিম দিচ্ছেন এখন?"

আর একজন বলল, "শুনলাম দুটোর বেশী পাড়ছেন না, আস্তে বল, শুনতে পাবেন।"

কথাগুলো এত চাপা গলায় হচ্ছিল যে রামলাল বুঝতে পারেন না কাদের গলা। লোকটা "পাড়ছেন না" বলল, না "পারছেন না" বলল রামলাল ঠিক ধরতে পারলেন না।

রামলালের ইচ্ছে করল ছুটে গিয়ে লোকটার কান মলে দেন। ডাঁহা মিথ্যে কথা। রামলাল ঘুমের ঘোরে মুরগি ডাকের কথা না বুঝতে পারেন, কিন্তু ডিমও কি ঘুমের ঘোরে পাড়েন? গুজব। বাড়তে বাড়তে কোথায় পেঁছেছে দেখ।

pathagar.net

আবার শোনা গেল, "এই অসুখটার একটা কবিরাজি নাম আছে। বেশ বিকট গোছের। ঠিক মনে পড়ছে না। আরে, সান্নিপাতিকের মতো। হ্যাঁ, মনে পড়েছে, মোরগাবাতিক। শুধু নামই নয়, খুব ভালো কবিরাজি চিকিৎসাও আছে।"

"চল, সাহেবকে একবার বলে দেখবি ?"

"লাভ হবে না। রোগটার মজাই এমন যে, যার রোগটা হয়, সে কিছুতেই বুঝতে পারে না সে মুরগি হয়ে যাচ্ছে।"

"সাহেব অফিসে আসা বন্ধ করলে তো কারবার উঠে যাবে রে।"

"দেখ্, কাজকম্ম একটা জুটে যাবেই। সেটা কথা নয়। কিন্তু আমরা থাকতে মোরগবাতিক সাহেবকে কুরে কুরে খাবে আর আমরা কিছুই করতে পারব না, সেটা কি কম দুঃখের ?"

"দুঃখের কথা নয় ভাই, একেবারে মর্মান্তিক। দুর্দিনে সাহেব কি আমাদের কম দেখেছেন ! এমন সাহেব ক'টা হয় ?"

রামলালের মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। রামলাল বুঝতে পারলেন, তিনি সত্যিই আস্তে আস্তে একটা বড় মুরগি হয়ে যাচ্ছেন।

ডিম হয়তো আজকে পাড়ছেন না, কিন্তু আর ক'দিন বাদে ঠিকই পাড়বেন। শুধু তাই নয়, তখন তাঁকে কারবারে আসা বন্ধ করতে হবে, আর এই লোকগুলো, যারা তাঁকে এত ভালবাসে, সবাই বৌ-ছেলের হাত ধরে রাস্তায় দাঁড়াবে।

রামলাল হাঁক পাড়লেন, "রতনলাল!"

"জী", বলে রতনলাল এসে দাঁড়ায়।

"ঘর চলো", বলেন রামলাল।

* * *

বাড়ি ফিরে রামলালের মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। তিনি সটান শুয়ে পড়লেন বিছানায়।

মন্দাকিনি বললেন, "কি হল, শরীর খারাপ লাগছে?"

রামলাল বললেন, "মাথাটা ঝিমঝিম করছে, একটু ঘুমোবো।"

মন্দাকিনি বললেন, "কিন্তু দুপুরে ঘুমোনো যোগীরপক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।"

রামলাল গম্ভীরভাবে বললেন, "জানি।"

রামলাল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলেন, তাঁর চারপাশে এক পাল মুরগি ঘুরে ঘুরে নাচছে আর তাঁকে দলে টানার জন্য হাতছানি দিচ্ছে। হাতছানি তো আর নয়, ডানাছানি। ঘুম ভেঙে গেল। জামাকাপড় ঘামে ভিজে গেছে। ছ'টা বাজে।

রামলাল ঘুম থেকে উঠেই চলে গেলেন আয়নার সামনে। মুখটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। ঘাড়ের লোমগুলো কিন্তু একটু যেন রোঁয়া রোঁয়া মনে হচ্ছে। তার বেশী কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

সেদিন সারা সন্ধ্যে রামলাল ছাতে পায়চারি করে কাটালেন।

যোগ সাধনায় এই প্রথম ছেদ পড়ল। মন্দাকিনি খেয়াল করলেন রামলাল গীতা স্পর্শ করেননি।

রাত্রে খেতে বসে শকুনিমামা জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার যোগসাধনায় কি কোনো বিঘ্ন ঘটেছে, না কি পুরোদস্তুর ত্যাগী হয়ে উঠে যোগ, গীতা সবই ত্যাগ করলে?"

রামলাল আর থাকতে না পেরে বলে ফেললেন, "আপনাদের সকলেরই মনে হচ্ছে আমি আস্তে আস্তে মুরগির মতো হয়ে যাচ্ছি তাই না?"

তিনজনই সমস্বরে বলল "ঠিক তাই।"

রামলাল বললেন, "আমারও আজ দুপুর থেকে তাই মনে হচ্ছে, কিন্তু আয়নার সামনে দাঁড়িয়েও ঠিক বুঝতে পারছি না।"

শকুনিমামা বললেন, "না বোঝারই কথা। দাঁড়াও, বুঝিয়ে দিচ্ছি। শ্যাম্‌লা, বল্‌তো একটা মাছি ঘরে ঢুকলে কি করে বুঝবি মাছিটা মেয়ে না ছেলে?"

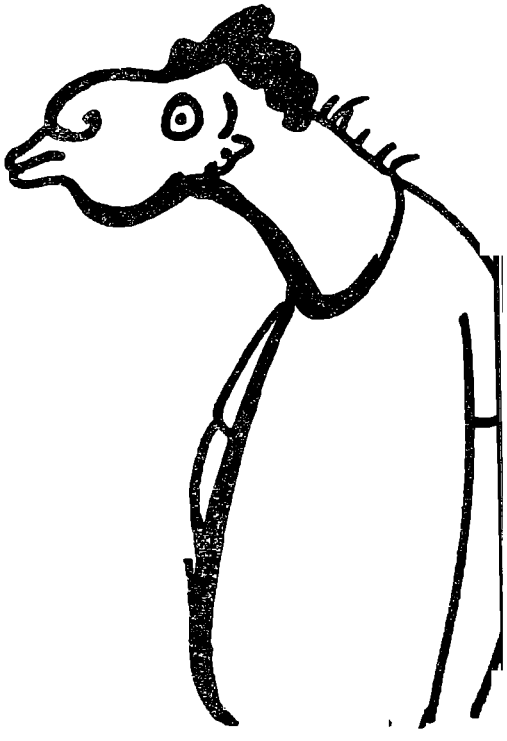

শ্যামলাল বলল, "এই মজাটা কিন্তু বহুযুগ আগে ঠোঙা হয়ে গেছে। মেয়ে মাছি হলে ঘরে ঢুকে প্রথমেই আয়নার ওপর বসবে। তাই দেখেই বোঝা যাবে মাছিটা মেয়ে।"

শকুনিমামা জিজ্ঞেস করেন, "আর মাছিটা কি দেখবে বলতো?"

মন্দাকিনি বলেন, "কি আবার দেখবে! নিজেকে দেখবে।"

শকুনিমামা লাফিয়ে ওঠেন, "ঠিক বলেছ বৌমা। নিজেকে দেখবে। একবারও ভাববে না একটা মাছি দেখছি। ভাববে আমি আমাকে দেখছি—সেই চির চেনা সুন্দরী এক নারী। চক্ষে অঞ্জন, ওষ্ঠে রঞ্জন আর কণ্ঠে গুঞ্জন মাখালেই জগত মাৎ। তুমি যদি একটা আস্ত মুরগিও হয়ে যাও, আয়নায় দেখে বুঝতে পারবে না। যখনই আয়না দেখবে, সেই একই কথা মনে হবে—আমি আমাকে দেখছি। সো অহং।"

সারারাত রামলালের ঘুম এলো না। খালি এপাশ-ওপাশ করলেন, আর জেগে জেগে দুঃস্বপ্ন দেখলেন। ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখা জেগে দুঃস্বপ্ন দেখার চেয়ে অনেক সুখের। ঘুম ভাঙলে স্বপ্নের শেষ হয়। রামলালের মনে হতে লাগল তিনি যে-কোনো সময় কোঁকর কোঁ করে উঠবেন! ক'দিন পর থেকে খালি ধান আর পোকামাকড় খেতে হবে

ভাবতেই তাঁর কান্না পেয়ে গেল। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম ভাঙল সাড়ে আটটায়।

সকালবেলায় শ্যামলাল বলল, "দাদা, কাছাকাছি একজন নামকরা সাইকিয়াট্রিস্ট আছেন, ডাঃ এস. রায়চৌধুরী, তাঁকে ধরে আনি বরং।"

রামলাল আপত্তি করলেন না। ডাক্তার রায়চৌধুরী এলেন বেলা বারোটার সময়। শকুনিমামা আলাপ করিয়ে দিলেন।

"ইনিই কদিন যাবৎ ক্রমাগত মনে করছেন যে আচার, আচরণ আর দর্শনে ইনি একটা আস্ত মুরগি হয়ে যাচ্ছেন।"

ডাঃ রায়চৌধুরী প্রাথমিক পরীক্ষা করে বললেন, "মনে হচ্ছে ফার্স্ট স্টেজ। ঠোকরাচ্ছেন কি?"

মন্দাকিনি বললেন, "না, ঠোকরানো একেবারেই বন্ধ।"

রামলাল জিজ্ঞেস করলেন, "এমনটা কি অনেকেই ভাবে?"

ডাক্তার একটা প্রাণখোলা হাসি হেসে বললেন, "হাসালেন মশাই। মুরগি তো মুরগি, নিজেদের আলমারী, সোফা-কাম-বেড মায় প্যাটন ট্যাঙ্ক অবধি ভাবতে দেখলাম। একজনের ঘরে ঢুকতে সে প্রথম দর্শনেই আমাকে গুড়ুম, গুড়ুম করে অভ্যর্থনা জানালো। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি কামান? উত্তর পেলাম, না, প্যাটন ট্যাঙ্ক। সাইকোলজি বড় সাংঘাতিক জিনিস মশাই। এর প্যাঁচে পড়ে লোকে কি না করে।

সাউথ ইণ্ডিয়ায় এক সাইকোলজিস্ট ভদ্রলোক হিপ্নোটিজমের ওপর রিসার্চ করতেন। তিনি রোজ একটা কাকাতুয়াকে হিপ্নোটাইজ্ করে বোঝাতেন সে কাকাতুয়ার থেকে মুরগি হয়ে যাচ্ছে। কাকাতুয়াটা হিপ্নোটাইজ্ড হতে হতে সত্যিই মুরগির রূপ ধারণ করল। আর বেশী কি বলব, সে একদিন একটা মুরগির ডিম পেড়ে ফেলল।"

শ্যামলাল জিজ্ঞেস করল, "ডিমটার কি হল?"

ডাক্তার বার দুই ঢোঁক গিলে বললেন, "ভদ্রলোকের কপাল খারাপ বুঝলেন, আগেভাগে ব্যবস্থা করেননি। কাকাতুয়াটা দাঁড়ে বসত; ডিমটা অতো উঁচু থেকে মাটিতে পড়ে ফেটে চৌচির। ডিমটা থাকলে ভদ্রলোক তুড়ি বাজিয়ে নোবেল প্রাইজ পেয়ে যেতেন। ডিমটা ফেটে যেতে দেখে সাইকোলজিস্ট তো কেঁদে আকুল। কান্না শুনে পড়শীরা এসে দেখল, ভদ্রলোক দাঁড়ে একটা মুরগি বসিয়ে তার সঙ্গে মস্করা করছেন। সবাই বলল, 'মাথাটা একেবারে গেছে।' ভদ্রলোক যতো বলেন, 'দেখেছ, খাস মুরগির ডিম।' পড়শীরা বলে, "তা মুরগি কিসের ডিম পাড়বে?

ঘোড়ার ?" সবাই মিলে পরামর্শ করে সাইকোলজিস্ট ভদ্রলোকটিকে পাঠিয়ে দিল আরো নাম করা এক সাইকোলজিস্টের কাছে। ওকথা যাক্, ঘাবড়াবার কিছুই নেই। বললাম না ফার্স্ট স্টেজ। ক'টা ওষুধ লিখে দিচ্ছি, খেলে ক'দিনেই ঠিক হয়ে যাবে।"

সাইকিয়াট্রিস্ট ভদ্রলোক ক'দিন পরে রিপোর্ট করতে বলে বিদায় নিলেন।

শকুনিমামা জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা রামলাল, হঠযোগের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বই কি ?"

রামলাল জানান, "হঠযোগ প্রদীপিকা আর ঘেরণ্ড সংহিতা।"

শকুনিমামা বললেন, "তাহলে ওই বইয়ে এইসব রোগের প্রতিকার থাকা বাঞ্ছনীয় নয় কি ?"

রামলাল বললেন, "তা ঠিক, কিন্তু বইগুলো একে পাওয়া যায় না, তায় কট্টর সংস্কৃতে লেখা। আমরা যে বইগুলো পড়ি তাতে ওগুলোর কেবল রেফারেন্স আছে।"

মন্দাকিনি বললেন, "ঠাকুরপো, তোমাদের ইস্কুলের সংস্কৃত স্যার মানে বাচস্পতিমশাই এ ব্যাপারে কিছু সাহায্য করতে পারেন না ? তুমিই তো বল, তাঁর মতো সংস্কৃতের পণ্ডিত দুনিয়ায় আর একটিও নেই।"

শ্যামলাল বলল, "তুমি বলেছ ঠিক বৌদি। যাবতীয় সংস্কৃত বই ওনার মুখস্থ, কিন্তু ওনার সামনে দাঁড়াতেই বড় লজ্জা আর ভয় করে।"

রামলাল আর শকুনিমামা একসঙ্গে বলে ওঠেন, "কেন, কেন ? ভয় করে কেন ?"

শ্যামলাল বলল, "ভয় একটাই। উনি সামনে পেলে প্রথমেই মার্তণ্ড, কুষ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড, ছুছুন্দর, লখিন্দর প্রভৃতি গাল পাড়বেন তারপর কাজের কথায় আসবেন।

শকুনিমামা ও মন্দাকিনি চেপে ধরেন শ্যামলালকে।

"বড় ভাইয়ের জন্য এটুকু ত্যাগস্বীকার করতেই হবে।"

অগত্যা রাজী হয় শ্যামলাল।

* * *

পরের দিন সকাল থেকে শ্যামলাল উধাও। তার দেখা মিলল সেই সন্ধ্যায়। শ্যামলাল বাড়ি ঢুকল নাচতে নাচতে। সকলে জিজ্ঞেস করল, "এতক্ষণ কি করছিলি ?"

শ্যামলাল বলল, "এটা কি একটা সোজা কাজ? বাচস্পতিমশায়ের গালাগাল খেয়ে ওনাকে রাজি করিয়ে দুটো বইয়ের আগাপাশতলা ঘাঁটিয়েছি। এইসব বিকারের বিধান খুব পরিষ্কার দেওয়া আছে। কুক্কুটাসনে এরকমটা যদি হয়, তাহলে একটি মহৎ কুক্কুট অথবা কুক্কুটী মনে মনে উৎসর্গ করিয়া তৃপ্তি সহকারে ভক্ষণ করিলেই বিকার অচিরে বিনষ্ট হইবে।"

শকুনিমামা জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, এহেন বিকারে জাতক কুক্কুট না কুক্কুটীভাব প্রাপ্ত হবে সেকথা বলা নেই?"

শ্যামলাল বলল, "সেটা জাতকের রাশিফলের ওপর নির্ভরশীল। যেমন, দাদা কুক্কুটীর ভাব প্রাপ্ত হচ্ছিল।"

মন্দাকিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু 'মহৎ' শব্দটা বোঝা গেল না।"

শ্যামলাল বলল, "যে মোরগ বা মুরগী ডিম দেয় নাই, সে-ই মহৎ।"

শকুনিমামা বললেন, "তাহলে সব মোরগই মহৎ, তারা ডিম দেয় না বলেই তো জানি।"

মন্দাকিনি জুগিয়ে দেন, "অবশ্য সাইকোলজিস্টের পাল্লায় না পড়লে!"

শ্যামলাল বলল, "চল মামা, মহৎ কুক্কুট নিয়ে আসি বাজার থেকে।"

শকুনিমামা বললেন, "তৃপ্তি সহকারে ভক্ষণের কথা বলা আছে। ভীমকে ধরে আমরা পাঁচটি প্রাণী, একটি কুক্কুটে তৃপ্তি হবে কি? তার চেয়ে দুইটি আনা ভাল।"

শ্যামলাল বুঝিয়ে দেয়, "বাচস্পতিমশাই তখনই বলেছিলেন অধিকন্তু ন দোষায়।"

মন্দাকিনি তাড়া দেন, "তাড়াতাড়ি যাও ঠাকুরপো, আবার বাজার না বন্ধ হয়ে যায়।"

যতক্ষণ না মহৎ কুক্কুট বাড়ি পেঁছিল, রামলাল যোগের বই ও

গীতা যত্ন সহকারে তুলে ফেললেন। বললেন, "পরে নিশ্চয়ই কাজে লাগবে।"

সেদিন রাত্রে খাবার টেবিলে কথাবার্তা বিশেষ হল না পাছে তৃপ্তিতে গলদ হয়।

* * *

পরের দিন সকালে প্রাতরাশ সেরে রামলাল শ্যামলালের হাতে একটা একশো টাকার নোট ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "বড় বাঁচিয়েছিস ভাই। আমি হবিষ্যি থেকে ফেরার রাস্তাটা হারিয়ে ফেলেছিলাম।"

শ্যামলাল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। মন্দাকিনি মনে মনে হাসেন "বাচস্পতি মশায়ের ওষুধে মুরগি ভাবটা তো গেছেই, ঠোকরানোটাও ফিরে এসেছে।"

শকুনিমামা মন্দাকিনিকে ডেকে বললেন, "বৌমা, মনে হচ্ছে বিপদ কেটেছে। আমি আজই ফিরব। জমি নিয়ে একটা মামলা আছে।"

ন'টা কুড়ি মিনিটে রতনলাল এসে বলল, "গাড়ি হাজির।"

রামলাল হুংকার ছাড়লেন' "ন' বাজে আনা থা। তুম ন' বাজ্‌কর বিশ মিনিট পে আয়ে হো। অ্যায়সে করনে সে নৌকরিসে তুমহারা ছুট্টি হো যায়ে গা।"

রতনলালের বুকটা বহুদিন পরে নির্মল বাতাসের স্পন্দন অনুভব করল, আনন্দ-বিজড়িত কণ্ঠে সে বলল, "জী"।

pathagar.net

# মাধ্যাকর্ষণ

আর মোটে দুটো পিরিয়ড। তার পরেই ছুটি। ছেলেরা ছুটির অপেক্ষায় ব্যাকুল, কিন্তু নিশানাথবাবুর শনিবারের ক্লাশের ভয়ে ভীত।

নিশানাথবাবু জেনারেল সায়েন্সের টিচার। শনিবারের এই দ্বিতীয় পিরিয়ডটি তাঁর ভারি প্রিয়। পিরিয়ডের প্রথম অর্ধেক তিনি অন্যান্য ক্লাশের মতনই পড়াতেন, তাতে কোনো অসুবিধে ছিল না, কিন্তু দ্বিতীয় অর্ধেক ছিল তাঁর অতি শখের আর ছাত্রদের কাছে বিশেষ ভয়ের। নিশানাথবাবু, খুব বিখ্যাত একজন ভদ্রলোকের কথা আলোচনা করে, ছেলেদের জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করতেন আর ছেলেদের জর্জরিত করতেন সেই ভদ্রলোক সংক্রান্ত অজস্র প্রশ্নবাণে। এইসব খ্যাতিমান ভদ্রলোকেরা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকেই আসতেন আর তাঁদের কর্মজীবনের বৈচিত্র্য ছিল আরও প্রবল। প্রশ্নের কোনো সদুত্তর না পেলে বা পেলেও নিশানাথবাবু ছাত্রদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার মাঝে এক অদ্ভুত আনন্দ পেতেন। দৈবাৎ ক্লাশের কেউ সঠিক উত্তর দিলেও তাঁকে খুশি দেখাতো না। নিশানাথবাবু কখনও খতিয়ে দেখতেন না ক্লাশ সিক্সের ছাত্রদের পক্ষে কতোটা জানা সম্ভব। এই প্রশ্নের দুরন্ত ঢেউ একবার পেরোতে পারলেই কিন্তু স্থির সমুদ্র। তখন নিশানাথবাবু তাঁর

পাকড়াও করা সেই বিখ্যাত ভদ্রলোকটির কর্ম ও জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। নিশানাথবাবুর বলার ভঙ্গিটি ছিল খুবই আকর্ষণীয়। নাম-জাদা মানুষটিকে এতো সহজে চোখের ওপর তুলে ধরতেন যে মনে হতো তিনি নিজেই সেই লোক। কলম্বাসের গল্পে তাঁকে মনে হতো চোখে দূরবীন লাগিয়ে, জাহাজের ডেকে, জলদস্যুর সন্ধান করছেন। নেপোলি-য়নের গল্পে মনে হতো শত্রুর ঘাড় খামচে ধরেছেন, আর তুলসীদাসের গল্পে মনে হতো সদ্য রামলক্ষ্মণের সঙ্গে মৃগয়া সেরে ফিরেছেন।

নিশানাথবাবু প্রশ্ন করলেন, "হরিহর, বল স্যার আইজাক নিউটন কে ছিলেন?"

হরি নিউটনের নামটা শুনেছিল কিন্তু তিনি কে ছিলেন, বা কি করেছিলেন সে সম্বন্ধে তার কোনো ধারণাই ছিল না। সে উঠে আমতা আমতা করতে থাকলো। অবশ্য হরি বলতে পারতো যে নিউটন এক বিখ্যাত মানুষ ছিলেন। তিনি সমাজকল্যাণকর কাজে জীবন কাটান। এই কথাগুলো নিশানাথবাবুর সমস্ত ভদ্রলোকের বেলাতেই খাটে। কিন্তু আগে দুয়েকবার ওই কথাগুলো চালানোর চেষ্টা তেমন সফল না হওয়ার জন্য হরি চেপে গেল। পেছনের বেঞ্চির সিদ্ধেশ্বরের জ্ঞান কিঞ্চিৎ বেশি। সে পিছন থেকে হরিকে নিচু গলায় বলল, "বল বৈজ্ঞানিক ছিলেন। আপেল পড়া দেখেন।"

হরি বেচারা গালাগাল এড়ানোর প্রাণপণ চেষ্টায় বলল, "স্যার, নিউটন সাহেব এক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তিনিই প্রথম আপেল পড়া দেখেন।"

হরি যে কেন নিউটন সাহেব বললো বোঝা গেল না। তার নিশ্চয়ই মনে হয়েছিল যে সাহেব জাতীয় একটা উপাধি হয়তো নিশানাথবাবুকে কিঞ্চিৎ নরম করবে। নিশানাথবাবু উত্তর শুনে, মুখটা হাজারিবাগের বেলের মতন করে বললেন—"তুই একটা গাধা। আপেল পড়া দেখলে কেউ বিখ্যাত হয়? কাশ্মীরের লোকে দিনরাত আপেল পড়া দেখে। বড়ো মেজো, ছোটো সব ধরনের আপেল। তারা কি সকলে বিখ্যাত?"

হরি বলতে যাচ্ছিল যে সেই আপেলের বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই ছিল যা উদ্ভিদ জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু হাওয়া খারাপ দেখে চেপে গেল। নিশানাথবাবু আরম্ভ করেছিলেন ক্লাশের মাঝখান থেকে। হরির বাঁদিকে কনক আর ডানদিকে ক্যাবলা শঙ্কিত মুখে বসে ছিল। হয় বাঁদিক নয় ডানদিক। এই নিশানাথবাবুর নিয়ম। প্রশ্ন একদিক ধরে

চলবে বেঞ্চি অতিক্রম করতে করতে। একদিক বাঁচবে আর একদিক কাতরাবে। নেহাত কপাল মন্দ না হলে প্রশ্ন এদিক ওদিক লাফায় না। নিশানাথবাবু ডানদিকই বাছলেন। "তুই বল।" ক্যাবলা একটু মাথা চুলকে বললে—"জানি না স্যার।" অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে এই সহজ পন্থাটাই সবচেয়ে ভাল। কিন্তু আজ খাটলো না। "চেষ্টা কর"—বললেন নিশানাথবাবু।

নিশানাথবাবুর এ ভারি অন্যায় আবদার। এই প্রশ্ন না জানলে কি চেষ্টা করে লাভ হয়? এ কি রচনা লেখা যে চেষ্টা করে কার সঙ্গে যোগাযোগ আছে ভেবে বার করে তারপর ঝর্‌ঝর্‌ করে তৈরি করবে? ক্যাবলার নিউটনের সঙ্গে ব্যাডমিণ্টন ছাড়া কিছুরই যোগ আছে বলে মনে হলো না। বলল, "পারছি না, স্যার।" নিশানাথবাবু এবার তাঁর সেই গা জ্বালানো হাসি হেসে উঠলেন। হাসিটা বড়োই অপমানজনক। তার চল্লিশ ভাগ শ্লেষ, কুড়ি ভাগ বিরক্তি আর বাকি চল্লিশ ভাগ নিষ্ঠুর আনন্দ।

নিশানাথবাবুর প্রশ্ন হঠাৎ লাফালো। "নয়ন, তুই বল।" নয়ন শেষের আগের বেঞ্চিতে নির্ভাবনায় বসে একমনে চুইংগাম চিবোচ্ছিল। নয়ন ভালো খেলোয়াড়। বই-খাতার সঙ্গে সম্পর্ক কম। সে অনেক ভেবেছে নিশানাথবাবু কেন পেলে বা সোবার্সের কথা তোলেন না? তাঁরা কি কারুর চেয়ে কম বিখ্যাত? সারাজীবন এতো লোককে আনন্দ দিয়েছেন, কই তাঁদের তো ডাকা হয় না? একবার ডাকলে ঝাড়া সাতটা পিরিয়ড নয়ন একাই একনাগাড়ে বলে যেতে পারে। অতর্কিত আক্রমণে নয়ন একটু ঘাবড়ে গিয়ে উঠে দাঁড়ালো। নয়নের চুইংগাম চিবোনো দেখে নিশানাথবাবু ফেটে পড়লেন—"তুই তো হতভাগা দেখছি দুদিন পরে মাস্টারের মুখের ওপর···এক্ষুণি চুইংগাম ফেলে দিয়ে আয়। আমাদের সময় জানিস্‌ মাস্টারমশায়ের দিকে চোখ তুলে তাকালে ক্লাশ থেকে বার করে দিতেন।"

নয়ন কাঁচুমাচু মুখে বেঞ্চি থেকে বেরিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও চুইংগাম ফেলে এলো। নিশানাথবাবু নয়নকে চিনতেন। তাই নয়ন ফেরার আগেই প্রশ্ন চলে গেল সায়নের ঘাড়ে। সায়ন উঠেই ইতস্তত না করে দৃপ্ত ভঙ্গিতে বললো "স্যার নিউটন আপেল পড়াই দেখেছিলেন। আগেও অনেক লোকই আপেল পড়া দেখেছিল এবং রোজই অনেকে আপেল পড়া দেখে সেটা ঠিক। সাধারণ লোকে টপ্‌ করে আপেলটা

pathagar.net

কামড়ে খেয়ে ফেলতো কিন্তু নিউটন লোভ সংবরণ করতে পেরেছিলেন, আর আপেলটাকে লাগিয়েছিলেন বিভিন্ন গভীর বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যার থেকে তাঁর খ্যাতি দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমত লোভ সংবরণ করার জন্য, দ্বিতীয়তঃ বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য।"

লোভ সংবরণের জন্য নিউটনের নাম ছিল কি না নিশানাথবাবুর জানা ছিল না, তাই তিনি একটু থতমত খেয়ে গেলেন। কিছু বললেন তো না-ই, উপরন্তু সেই কাষ্ঠহাসিটিও বিসর্জন দিয়ে বললেন—"বেড়ে পাশ কাটাতে শিখেছিস।"

পরের জন স্বপন। সে কিছু বেশি খবর রাখে। সে বলল—"স্যার, নিউটন আপেল দিয়ে মাধ্যাকর্ষণকে চেপে ধরেন। মাধ্যাকর্ষণ হয়তো আগেও ছিল আর পরেও থাকবে কিন্তু নিউটনই প্রথম তাকে চেপে ধরে লিপিবদ্ধ করে দেন।"

চেপে ধরেন শুনে নিশানাথবাবু ক্ষেপে উঠলেন—"মাধ্যাকর্ষণ কি সিঁধেল চোর না নেংটি ইঁদুর যে চেপে ধরবে? তায় আবার আপেল দিয়ে, ঝুড়ি ধামা হলেও বা বোঝা যেতো।"

পিরিয়ডের বেশ খানিকটা সময় কেটে গিয়েছিল তাই নিউটন মাধ্যাকর্ষণকে চেপে ধরেছিলেন না মাধ্যাকর্ষণই নিউটন আর আপেলকে চেপে ধরেছিলেন সে তর্কে না গিয়ে তিনি শেষ প্রশ্ন আনন্দকে করলেন—"মাধ্যাকর্ষণ কাকে বলে?"

আনন্দর কান লাল হয়ে ওঠে। জীবনের বেশির ভাগ আকর্ষণই আনন্দ কানে অনুভব করেছে, তাই আকর্ষণের কথা শুনলেই তার কান লাল হয়ে ওঠে। আনন্দ বললো—"স্যার, মাধ্যাকর্ষণ মানে মধ্যের প্রতি আকর্ষণ।"

নিশানাথবাবু অল্প খুশি হলেন। চশমা খুলে মুছে নিলেন। বোঝা গেল তাঁর প্রশ্ন শেষ। পিরিয়ডের বাকি পনেরো মিনিট তিনি নিউটনের ব্যক্তিত্ব ও কর্মজীবনের গুণকীর্তন করলেন যার মূল বিষয় ছিল মাধ্যাকর্ষণ। আমরা সকলে জেনে পুলকিত হলাম যে দুনিয়ার সকল জীব-জন্তু, পাহাড়-পর্বত, মাছ, নদী, খাট, আলমারি সকলে সকলকে টানে আর এই টানের জোরেই সব জিনিস পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ে। আমি টানছি নগেনকে, নগেন নিশানাথবাবুকে নিশানাথবাবু হেডস্যারকে। আমাদের টানছে ছুটির ঘণ্টা, আমরা ছুটির ঘণ্টাকে। আমরা খেলার মাঠের, বা জু গার্ডেনের টান অনেক সময়ই অনুভব

pathagar.net

করেছি, কিন্তু হেডস্যার বা নিশানাথবাবু যে আমাদের টানছেন, তা জানা ছিল না, কি অদ্ভুত !

ক্লাশের ঘণ্টা বেজে গেল। নিশানাথবাবু মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। সামনেই অঙ্কের স্যার শুভঙ্করবাবু—তাঁর সঙ্গে ব্রিজ খেলার আলোচনায় মেতে উঠলেন।

গল্প সেরে শুভঙ্করবাবু ক্লাশে ঢুকেছেন সবে, হঠাৎ ক্লাশের বাইরে থেকে বাবা গো শব্দে আর্তনাদ ও ধপ্ করে কেউ একটা পড়ার শব্দ হলো। বাইরে বেরিয়ে দেখি, ঠিক যা ভেবেছিলাম তাই। নিশানাথ-বাবু মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন—নট নড়ন-চড়ন। শুভঙ্করবাবু আর আমরা ধরাধরি করে চিৎ করে দিলাম। নিশানাথবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন—"ভূ···ত", বলেই মূর্ছা গেলেন।

ভূতের উপদ্রবটা ইস্কুলে বেড়েই চলেছিল। ভূতের প্রথম রিপোর্টটা এসেছিল দারোয়ান শিউচরণের কাছ থেকে। সে হেডস্যারকে সরাসরি বলেছিল—"স্যার, একঠো ভূত রোজ সন্ধে কে বাদ বহুৎ ডিস্টার্বিং করে। উসকো না ভাগালে বড়া মুস্কিল।"

শিউচরণ গত ছয় বছর যাবৎ ইস্কুলে চাকরি করছে। ভারী তেজী লোক। ইয়া ছাতি, ইয়া দাড়ি, ইয়া মাস্‌ল্। ভয় পাওয়ার লোক শিউচরণ নয় এবং সে যে আদপেই ভয় পায়নি সেটা বোঝানোর জন্যই সে ভূতটির বিরক্ত করার কথা বলেছিল। শিউচরণের কথা থেকে হেড-স্যার বুঝতে পারলেন ভূতটি বাস্তবিকই বিরক্তিকর। সে অবসর পেলেই শিউচরণের পাকানো রুটি খেয়ে নেয়, কুঁজো থেকে জল ফেলে দেয়, মোমবাতি নিয়ে পালায় আর ঘুমোবার সময় বুকে চেপে বসে, নয় নাকে সুড়সুড়ি দেয়। অপর দারোয়ান লীলারামকে জিজ্ঞেস করাতে সে নীরবে সায় দিয়েছিল। ভূতের কথাটা হেডস্যারের ঘর থেকে মাস্টারদের মারফৎ ছেলেদের ভেতর ছড়িয়ে পড়েছিল। অনেকে ভূতটার একটা চেহারাও জুড়েছিল গল্পটার সঙ্গে। আমরা প্রথমটায় বিশ্বাস করিনি। ভেবেছিলাম, সন্ধ্যেবেলায় দারোয়ানগুলো গাঁজা-টাজা খায়। কিন্তু হরি একদিন বিকেলে বাথরুম থেকে এক দৌড়ে বেরিয়ে এলো হাঁপাতে হাঁপাতে। হাঁপানি থামলে হরি বললো, সে স্পষ্ট দেখেছে একটা ভূত বাথরুমের বাইরের দিকের জানলা থেকে সড়াৎ করে সরে গেল। হরি এমনি এমনি ভয় পাওয়ার ছেলেই নয়। রোজ সকালে আদা ছোলা খেয়ে

ডন বৈঠক দেয়। আমরা বিকেলে ভূত দেখার ব্যাপারটা একটু অবিশ্বাস্য বলাতে নগেন বলেছিল—"আরে বাবা, প্রবাদেই তো আছে—'ঠিক দুক্কুর বেলা যখন ভূতে মারে ঢেলা'। অর্থাৎ দুপুরবেলাতেই যদি ভূতে ঢেলা মারতে পারে তাহলে বিকেলবেলা তো ভূতে যা খুশি তাই করতে পারে।"

এ কথার কেউ কোনো জবাব দিতে পারলো না, সকলেই মেনে নিল। তারপর থেকে প্রায়ই অনেকে ইস্কুলের আনাচেকানাচে ভূত দেখতে আরম্ভ করলো। কিন্তু ভূতটি বা ভূতগুলো অতি ভদ্র। খালি দর্শন দেওয়া বা দাঁত খিঁচোনোর বেশি কোনো অপকার করেনি কখনও। আমরা অনেক দিন টিফিনের কৌটো, পেন্সিল বক্স ইত্যাদি এদিক-ওদিক ফেলে রেখে দেখেছি কখনও কিছু খোয়া যায়নি। এমন কি গোপাল একদিন ভূতদের প্রিয় খাদ্য শুঁটকী মাছ রেখে দিয়েছিল, ভূতগুলো তাও ছোঁয়নি। আজই তারা প্রথম আক্রমণ করলো নিশানাথবাবুকে।

দু মিনিটের মধ্যেই একটা শোরগোল পড়ে গেল। সমস্ত স্যারেরা মায় হেডস্যার অবধি দৌড়ে এলেন। ছেলেরা আর স্যারেরা ধরাধরি করে নিশানাথবাবুকে টিচারস রুমে নিয়ে গেলেন। নিশানাথবাবুকে শুইয়ে দেওয়া হলো পাখার তলায়, টেবিলের ওপর। পাঞ্জাবিটা ঢিলে করে দেওয়া হলো, চশমা আর জুতো খুলে নেওয়া হলো। মুখে একটু জলের ঝাপটা দিতেই নিশানাথবাবু চোখ খুললেন। সকলে উদগ্রীব হয়ে উঠলো সঠিক কি ঘটেছিল জানবার জন্যে। নিশানাথবাবু বললেন —"বারান্দায় শুভঙ্করের সঙ্গে কথা বলে যেই এগোতে গেছি, ভূতটা আমার পা ধরে পেছনের দিকে এক হ্যাঁচকা টান মারলো আর আমিও বাবাগো বলে সটান পড়ে গেলাম।"

ইস্কুলে ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যাদের কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল এই অকাট্য প্রমাণে তাদের সমস্ত সন্দেহ উপে গেল। হেডস্যার বললেন— "ভারি বিপদ। ভূতের কথাটা বহুবার কানে এসেছে, তেমন কান দিইনি, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে কিছু একটা না করলেই নয়। আজ নিশানাথকে ফেলে দিয়েছে, কাল কাউকে আঁচড়ে দেবে, তার পরদিন কারুর গলা টিপে ধরবে। একটা বিহিত করতেই হচ্ছে। সকলে ভাবো কি করা যায়।"

স্যারেরা ও আমরা যতো ছাত্র ছিলাম কাছাকাছি, সকলে ভাবনায় পড়লাম। ভূতের প্রতিষেধক তো কিছু জানা নেই। কেমিস্ট্রির স্যার ফটিকবাবুর বয়স অল্প আর একটু বেশি কথা বলেন। তার ধারণায়

পৃথিবীর যে কোনো সমস্যার একটা কেমিক্যাল সল্যুশন হয়। ফটিক-বাবু বললেন—"ইস্কুলের চারিদিকে একটু ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে দেখা যেতে পারে।"

নিশানাথবাবু কটমট করে তাকালেন।

হেডস্যার ক্রুদ্ধ গলায় বললেন—"ফটিক, ছেলেমানুষী কোরো না। ভূত কি মশা নাকি তেলাপোকা যে ব্লিচিং পাউডারে পালাবে?"

এতো বিপদের মধ্যেও অনেকে ফিক্ করে হেসে ফেলল। ফটিক-বাবুর মুখ দেখে মনে হলো ছাত্রদের সামনে বকুনিতে বড়োই ব্যথা পেয়েছেন।

হঠাৎ পিছন থেকে গম্ভীর গলায় ভাঙা বাংলায় কে বলে উঠলো—"স্যার, হামি একটা রাস্তা বাতলাতে পারে।"

সকলে মুখ ফিরিয়ে দেখলো শিউচরণ আর লীলারাম গুটিগুটি এসে হাজির হয়েছে। শিউচরণের কিছু বলার থাকতেই পারে, কারণ ভূতটিকে সেই প্রথম আবিষ্কার করে। কারুর অনুমতির অপেক্ষা না রেখে শিউচরণ বলে চললো—"ইস্কুল কা চার কোণে পেড়কে গায়ে চাকু দিয়ে আটবার রামনাম লিখে, গঙ্গাজলের হাণ্ডা ঝুলানেসে ভূত তো ক্যা উসকা বাপ ভি ভেগে যাবে। এ্যায়সা হামার দেশে কতবার দেখলো।"

এখন মুস্কিল হলো ইস্কুলের তিন কোণে তিনটি গাছ ঠিকই আছে কিন্তু চতুর্থ কোণে কোনো গাছ নেই।

শিউচরণই সমস্যার সমাধান করলো—"কোই বাত নহী, একটা বাঁশ লাগিয়ে লিলে হোবে।"

সকলে হাঁফ ছাড়লো। বৃন্দাবন আমার কানে কানে বলল—"তার চেয়ে ইস্কুলময় শক্ত শক্ত translation আর অঙ্কের বই ছড়িয়ে দেওয়া ভালো। ভূত বাছাধন টের পাবে—একদিনেই পগার পার।"

শিউচরণের বিধানে হেডস্যার বোধহয় খুব আশ্বস্ত হলেন না। ভাবলেন, বিহারের ভূতের ওষুধ কি বাংলায় চলবে? বললেন—"এ ব্যাপারে একবার বাচস্পতি মশায়ের মতামতটা নেওয়া উচিত।"

বাচস্পতি মশায় বলা বাহুল্য সংস্কৃতের স্যার। সবার বয়োজ্যেষ্ঠ। টিচার্সরুমের এক কোণে বসে এই ফাঁকে অভ্যাসমতো একটু ঝিমিয়ে নিচ্ছিলেন। হেডস্যারের গলায় নিজের নাম শুনে ঝিমোনো বন্ধ করলেন। সমস্যার আদ্যোপান্ত শুনে গভীর এক টিপ নস্যি নিয়ে ভাবতে বসলেন। মিনিট দুয়েক সকলে চুপচাপ, তারপর বাচস্পতি

মশায় বললেন—"স্বস্ত্যয়ন করিতে হইবে।" আবার দু' মিনিটের স্তব্ধতার পর বললেন—"প্রায়শ্চিত্ত চাই। আগে প্রায়শ্চিত্ত, তবে স্বস্ত্যয়ন।"

হেডস্যার জিজ্ঞেস করলেন—"প্রায়শ্চিত্ত কি প্রকার ?"

বাচস্পতি মশায় বললেন—"অতি সহজ। ঈষৎ গোময় ও কিঞ্চিৎ মধুচন্দন গঙ্গাজলের সহিত মাড়িয়া, ইস্কুলের ঈশান কোণে দাঁড়াইয়া নৈর্ঋত কোণের দিকে মুখ করিয়া এক ঢোকে গলাধঃকরণ করিলেই হইবে।"

হেডস্যার প্রশ্ন করলেন—"তা তো বোঝা গেল। কিন্তু গলাধঃকরণ করবে কে ?"

বাচস্পতি মশায় বললেন—"কর্তা করতে ক্রিয়া। অথাৎ কর্তাকেই ক্রিয়া করিতে হইবে। এই ইস্কুলের আপনি হেডস্যার সুতরাং কর্তা, এই ক্রিয়া আপনারই কর্তব্য।"

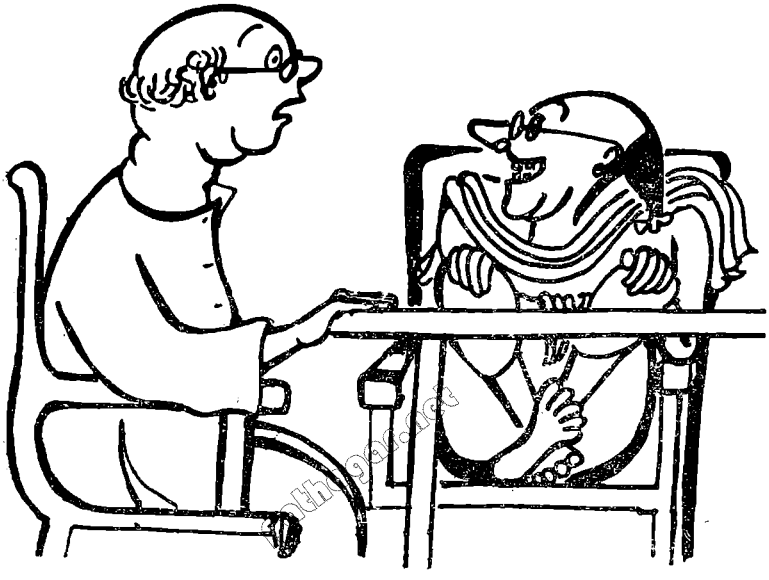

বৃন্দাবন আবার আমার কানে কানে বললো—"দেখেছিস, এর মধ্যেই কর্তা, ক্রিয়া, করণ সমস্তই এনে ফেলেছেন আর পাঁচ মিনিটের মাথায় হেড-স্যারকে যদি টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে ভূতের ধাতুরূপ না বলতে হয় তো আমি কান কাটবো।"

প্রায়শ্চিত্তের কথাটা হেডস্যারের বিন্দুমাত্র মনঃপূত হয়নি। তিনি তাঁর মুখটি স্বভাবসিদ্ধ কোলা ব্যাঙপানা করে চুপ করে রইলেন। সকলের মঙ্গলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করবো না-ও বলতে পারেন না, ওদিকে বাচস্পতি মশায়ের কথায় হাঁ-ও বলতে পারেন না।

বাচস্পতি মশায় বলে চললেন—"প্রায়শ্চিত্তের পর বাকি অংশ অতি সহজ। বৃহৎ মন্ত্রপূতঃ গীতাচূর্ণ গঙ্গাজলে মাড়িয়া বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্থানে লেপন করিলেই ভূতের ঊর্ধ্বতন, অধঃস্তন চতুর্দশ পুরুষ বিদ্যালয়ের ত্রিসীমানা হইতে পলায়মান হইবে।"

সকলের মুখ দেখে মনে হলো মন্ত্রটি বৃহৎ না গীতাটি বৃহৎ হওয়া দরকার তা সকলেই জানতে চায়, কিন্তু বাচস্পতি স্যারকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলো না। বোধহয় উল্লুক, বেল্লিক, গর্ধভ, ঋষভ, পাষণ্ড, কুষ্মাণ্ড, দোর্দণ্ড প্রভৃতি অলঙ্কারে ভূষিত হবার ভয়ে। ফটিকবাবুর সদ্য বকুনি খাওয়া দেখে সবাই চেপে গেল। হেডস্যারের মুখ দেখে বাচস্পতি মশায়ের বোধকরি করুণা হলো।

তিনি বললেন—"প্রায়শ্চিত্ত না করিলেও চলে, তবে পরিবর্তে একটি ছোট যজ্ঞ করিতে হইবে।"

হেডস্যার লাফিয়ে উঠলেন—"আমিও তাই ভাবছিলাম আপনি কতক্ষণে যজ্ঞের কথা বলেন। যজ্ঞ না হলে পরে কি আর ভূত পালায়?"

শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো যে দুটি বিধানই করা হবে।

বাচস্পতি মশায় বললেন—"অধিকন্তু ন দোষায়।"

মানে শিউচরণের রামনাম আর বাচস্পতি মশায়ের বৃহৎ গীতাচূর্ণ একসাথে লেফ্‌ট্‌ ও রাইট আউটের মতন খেলবে।

নিশানাথবাবু এতক্ষণে পুরোপুরি ধাতস্থ হয়েছেন। তিনি মাঝে এক কাপ গরম দুধ খেয়ে আরাম করছিলেন। হঠাৎ বললেন—"এই যাঃ, একেবারে ভুলে গেছি, ছটার শোয়ে গিন্নীকে নিয়ে সিনেমা যাবার কথা —টিকিট কাটা আছে।"

নিশানাথবাবু উঠে বসে চটপট জামার বোতাম আঁটতে থাকলেন। ক্যাবলা তাঁর চটিজোড়া নিয়ে এলো। বাচস্পতি মশায় সর্বদা বলেন—"গুরুর পাদুকা শিরোধার্য।"

ক্যাবলা শিরে না আনলেও যথেষ্ট সম্মান দিয়ে নিশানাথবাবুকে চটি পরিয়ে দিল। নিশানাথবাবু টেবিল থেকে নামার সময় হঠাৎ

হেডস্যার জিজ্ঞাসা করলেন—"নিশানাথ, তোমার চটির তলায় ওটা কি সাদা মতন ?"

নিশানাথবাবু চটি খুলে ফেললেন। ভালো করে দেখে সকলে বুঝলো, সাদা বস্তুটি আর কিছুই নয়—বড়ো একদলা চুইংগাম। মুহূর্তে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

নয়নের চুইংগামের আকর্ষণ আর মাধ্যাকর্ষণের ফলটি নিশানাথবাবু সামলাতে পারেননি। নিশানাথবাবুও অল্প সময়ে ব্যাপারটা বুঝলেন। রক্তচক্ষু করে ডাকলেন —"নয়ন!"

নয়ন এতক্ষণ আমার পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল কিন্তু পেছন ফিরে দেখলাম তার টিকিটিও নেই।

pathagar.net

# "কুঁ-কুঁ-কুঁ"

"দাঁড়া, মজা দেখাচ্ছি।" বললো রাঘব আর বোয়াল, স্কুল হস্টেলে আমাদের ঘরে বসে।

"কি করবি ?" জানতে চাইলো নয়ন।

"দেখতেই পাবি কাল।"

রাঘব আর বোয়াল আমাদের সঙ্গেই ক্লাস টেনে পড়তো কিন্তু ওরা স্কুল হস্টেলে থাকতো না। থাকতো না বললে ভুল বলা হবে। রেজিস্টারে ওদের নাম লেখানো ছিল না বটে, কিন্তু ওরা বেশির ভাগ

pathagar.net

সময়েই থাকতো হস্টেলে আমার আর নয়নের ঘরে। বোয়াল নামটা আমাদেরই দেওয়া। রাঘবের সঙ্গে মিলিয়ে। ওর আসল নাম বিজয়। বিজয় প্রথমটা আপত্তি করলেও পরে নামটার জনপ্রিয়তার জন্য একরকম মেনেই নিয়েছিল। রাঘব আর বোয়াল থাকতো পাশাপাশি বাড়িতে। হস্টেল থেকে মিনিট বারোর হাঁটা পথ। ওদের এলাকায় সকলেই মোটামুটি ওদের সমঝে চলতো। একটা বিশাল দল ছিল ওদের। সাত থেকে সতেরোর গোটা চল্লিশ ছেলে। রাঘব আর বোয়াল ছিল দলের পাণ্ডা। একবার হাঁক লাগালেই পিল পিল করে এসে জুটতো সব। রাঘব আর বোয়ালকে লোকে ভালবাসার চেয়ে বেশী ভয়ই করতো।

সেদিনকার ঘটনাটাকে অনেকেই হয়তো মামুলী বলতো কিন্তু রাঘব আর বোয়ালের কাছে মোটেই তা ছিল না।

এক কোট-টাই পরা ভদ্রলোক এসে আমাদের অঙ্কের স্যার শুভঙ্কর-বাবুকে অপমান করে গেছেন। ক্লাস ফাইভের একটা ছেলেকে শুভঙ্কর-বাবু গোল্লা দিয়েছিলেন। ভদ্রলোকটি ওরই বাবা। থাকেন ইস্কুলের এলাকাতেই। উঁচুদরের গভর্নমেণ্ট অফিসার।

ভদ্রলোক বলেছিলেন "আমার ছেলে গোল্লা পেতেই পারে না।"

শুভঙ্করবাবু জবাব দিয়েছিলেন "গোল্লার চেয়ে যদি কম নম্বর থাকতো তাহলে আমি তাই-ই দিতাম আপনার ছেলেকে।"

ভদ্রলোকটি শুভঙ্কর বাবুকে শাসিয়ে গেলেন, "আমি দেখবো কি করে আপনার চাকরী টেকে।"

রাঘব বললো "শুভঙ্করবাবুকে অপমান করে গেল আর তোরা হাঁ করে দেখলি! পারলি না দুটো থাপ্পড় লাগাতে?"

আমি আর নয়ন একটু লজ্জা পেয়ে চুপ করে রইলাম।

শুভঙ্করবাবুকে রাঘব আর বোয়াল একটু বেশীই শ্রদ্ধা করতো। কারণটা খুব পরিষ্কার। শুভঙ্করবাবু কোনও দিনই ওদের দাঁড়ানো বা নীলডাউনের বেশী কোনও সাজা দেননি। যেখানে অন্য যে কোনও স্যার হলে অনেক বেশী অবহেলা ভরা অপমানজনক ওষুধ দিতেন।

পরের দিন রাঘব বোয়ালের কেউই স্কুলে এলো না। পড়ন্ত বিকেলে হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলেন সেই কোট-টাইওলা ভদ্রলোক। গতকালের চেকনাই নেই, কেমন যেন অসহায় ভাব। ছুটির পর ভদ্রলোক শুভঙ্কর-বাবুকে আর ছাড়েন না। "বাঁচান স্যার, ধনে-প্রাণে মারবে স্যার।"

ভদ্রলোক কাতর কণ্ঠে বলে চললেন, "আজ সকালে উঠেই দেখি

পুকুরের মাছগুলো সব মরে ভেসে উঠেছে। জলে কেউ ফলিডল বা অন্য বিষ মিশিয়েছিল। বেলা এগারোটা নাগাদ রে, রে করে গোটা তিরিশ ক্ষুদে বিচ্ছু বাগানে এসে হাজির হল। আম, জাম, ডাব কলা যা ছিল তা তো গেছেই, তার সঙ্গে গেছে মালীর ধুতি। বেচারা এক গলা জলে দাঁড়িয়ে আছে লজ্জায়। ওদের ভেতর দুটো পাণ্ডা আছে। আমাকে বলেছে "শুভঙ্করবাবুর কাছ থেকে লিখিয়ে আনুন, 'মাফ করেছেন' না হলে রাত্রে আপনার বাড়ির ইঁটগুলো পাইকিরি হারে বেচবো। আপনি দয়া করে লিখে দিন স্যার, যে কালকের ব্যাপারটা মিটে গেছে, নইলে ধনে-প্রাণে মারা পড়বো।"

শুভঙ্করবাবু বোধহয় মজা পাচ্ছিলেন "তা পুলিস ডাকলেন না কেন?"

"পুলিশ বলেছে, এই বয়সের ছেলেদের নামে কেস করতে গেলে আমরাই ভুগবো বেশী।"

শুভঙ্করবাবু ভদ্রলোককে নাকানি-চোবানি খাওয়াতে পারতেন। কিন্তু শিক্ষকদের মন খুব নরম হয়। অনেকটা আইসক্রীমের মতন। একটুতেই গলে যায়। শুভঙ্করবাবু কাগজে লিখে সই করে দিলেন "মিটে গেছে, শুভঙ্কর সেন।"

সেদিনই আমরা প্রথম টের পেলাম ইস্কুল এলাকাতে রাঘব, বোয়াল ঠিক কতোটা শক্তি ধরে।

প্রচুর প্রতিপত্তি থাকলেও, রাঘব, বোয়ালদের আর্থিক অবস্থা, করুণ বললে কম বলা হবে, ছিল একেবারে মর্মান্তিক। ওরা রেশন তোলার টাকাও অনেক সময়েই আমার আর নয়নের কাছ থেকে ধার নিতে বাধ্য হত। হস্টেলে, আমার আর নয়নের সরিয়ে রাখা ভাত গোগ্রাসে খেতে খেতে বহুদিন বলেছে "পেটের জ্বালা ঠিক কেমন তা তোরা বুঝবি না।"

একদিন খুব ভোরে রাঘব আর বোয়াল আমাদের ঘুম থেকে তুললো। বোয়াল বললো, "তিনশোটা টাকা ভীষণ দরকার। না হলেই নয়।"

আমি জানতাম কেন দরকার। রাঘবের বাবা ক'বছর ধরে খুবই অসুস্থ। ওষুধ বদ্যি করতে মাঝে মধ্যেই প্রচুর খরচ হয়। বললাম, "তিনশো টাকা কোথায় পাবো? আমার কাছে মোটে গোটা দশেক টাকা পড়ে আছে। বাড়ি গিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি। তবে লাভ হবে বলে মনে হয় না। আজ মাসের পঁচিশ তারিখ।"

নয়নের অবস্থাও আমারই মতন। ওর কাছেও দশ বারো টাকার

pathagar.net

বেশী নেই। নয়ন বললো, "একটা কাজ করবো ? হস্টেলের সকলের কাছ থেকে তোলার চেষ্টা করে দেখবো ?"

রাঘব রাজী হল না। বোঝা গেল আমাকে আর নয়নকে ছাড়া অন্যদের জড়াতে ওর মানে লাগছে। আমরা ছাড়া বাকিরা তো ঠিক ওদের বন্ধু না।

"কি করা যায় বল তো ?" রাঘবের মুখে চিন্তার ছায়া।

অনেক ভেবেও মাথায় কিছুই এলো না।

শীতের সন্ধ্যেটা বড়ো তাড়াহুড়ো করে নেমে পড়ে। যেন ট্রেন ফেল করবে। তারপর আর বাইরে প্রায় কিছুই করার থাকে না। হস্টেলে সাংঘাতিক মশা। সন্ধ্যে থেকে তাড়ানোর খেলা চলে। আমরা চেষ্টা করি ওদের তাড়াতে আর ওরা তাড়া করে আমাদের। আমরা দরজা জানলা বন্ধ করে তাস পিটছিলাম, হঠাৎ হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকলো রাঘব আর বোয়াল। দুজনের গায়েই আষ্টেপিষ্টে চাদর জড়ানো।

"কিরে ? কিছু ঠিক করতে পারলি ?" শুধোই আমি।

রাঘব কোনও উত্তর না দিয়ে চাদরের ভেতর থেকে যা টেনে বার করলো তা দেখে তো আমরা সকলে হাঁ।

ছোট্ট একটা কুকুরছানা। রাঘব একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো "ওটাকে তিনদিন তোদের কাছে রাখতে পারবি ?"

"এটা আর না পারার কি আছে ? কিন্তু হঠাৎ একটা ফালতু কুকুরের বাচ্চা তিন দিন রাখবি কেন ?" পাল্টা প্রশ্ন করলো নয়ন।

বোয়াল বললো, "রাঘবের ছোটমামা বেড়াতে এসেছেন। এটা ওনারই কুকুর। ফালতু নয়রে ; রীতিমত অ্যালসেশিয়ন। রাঘবের ঠাকুমার গঙ্গাজলের ঘড়া চেটে দিয়েছে বলে ওটাকে বাড়িতে রাখা যাবে না।"

আমি বা নয়ন, কেউই কথাটা বিশ্বাস করলাম না। বুঝলাম, মতলব একটা আছে, যেটা ওরা অন্য ছেলেদের সামনে ভাঙবে না।

কুকুরটাকে সকলে দেখতে লেগে গেছে উবু হয়ে বসে। মোটে আড়াইমাস বয়েস।

দুনিয়ার সব শিশুদেরই সৌন্দর্যের ওপর কিছু বাড়তি অধিকার আছে। কুকুর ছানাটাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। কিন্তু খুব খুঁটিয়ে না দেখলে রাস্তার কুকুরের বাচ্চার সাথে গরমিল বার করা শক্ত।

কুকুরের কথাটা ইতিমধ্যে রাষ্ট্র হয়ে গেছে হস্টেলে। দেখার জন্যে ঘরে ভিড় জমিয়েছে ছেলেরা। জুটে গেছে শোবার আর ঢাকা দেবার জন্য চটের থলে। এসে গেছে দুধ খাওয়ানোর বাটি আর দুধ। কুকুরটা চটের থলের ওপর দিব্যি গুটিগুটি ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ঘরে ঢোকার পর থেকে একটাই শব্দ মাঝে মাঝে করছে "কুঁ-কুঁ-কুঁ"।

রাত সাড়ে আটটার সময় কুকুরটা ঘুমোবে-টুমোবে বলে আমরা অন্য ছেলেগুলোকে ভাগিয়ে দিলাম।

"ব্যাপারটা এবার খোলসা কর" নয়ন আর কৌতূহল ধরে রাখতে পারছে না।

"এটা ছাড়া আর উপায় ছিল না", বললো রাঘব।

"আরে এটাটা কি সেটা তো বলবি আগে না কি?" আমি খিঁচিয়ে উঠলাম।

"অনেক ভেবে এটাই আমাদের মাথায় এলো বুঝলি—"

"ফের এটা এটা করলে মার খাবি।"

রাঘব কিন্তু মোটেই মজা করছিল না। ও এত উত্তেজিত ছিল যে সব ঘুলিয়ে যাচ্ছিল।

বোয়াল বললো—"তুই থাম। আমি বলছি। আমাদের পাড়ার থেকে সিকি মাইল দূরে একটা নতুন বাড়ি হয়েছে দেখেছিস? খুব রঙচঙে?"

"না দেখিনি রঙ-চঙ বাদ দিয়ে কাজের কথা বল।"

"বাড়িটাকে ঘিরে একটা বাগান আছে। বাড়িতে থাকেন এক মাঝ বয়সী ভদ্রলোক, নাম কি যেন দাস, বউ আর বছর ছয়েকের মেয়ে নিয়ে। মেয়েটা ভারি মিষ্টি আর মিশুকে, নাম ঝন্টি। ভদ্রলোকের পয়সা আছে। মোটর গাড়িতেই যাতায়াত করেন।"

"আসল কথা ছেড়ে বেকার কথা বাড়াচ্ছিস।" নয়ন বকে উঠলো।

"দরকার আছে বলেই বলছি।" পাল্টা ধমকালো বোয়াল।

"কুকুরটা ভদ্রলোক বেশ দাম দিয়ে কিনে এনেছিলেন মেয়ের জন্য, মাসখানেক আগে। ঝন্টির সাথে নাম মিলিয়ে ওর নাম দিয়েছেন "ঘন্টি"। ঝন্টি সব সময় কুকুরটাকে নিয়েই থাকে। খালি সন্ধ্যেবেলা, পড়ার সময় ঘন্টি বাঁধা থাকে দোতলায়।

আমাকে তো জানিস, এলাকার মোটামুটি সকলেই চেনে। আজ ঠিক সন্ধের পর আমি ভদ্রলোকের বাড়ির কলিংবেল বাজালাম।

ভদ্রমহিলা দরজা খুললেন, আমি বললাম, "বৌদি, আমরা সরস্বতী পুজো উপলক্ষে একটা ফাংশন করছি, আপনাকে কিন্তু গাইতে হবে।"

"মেয়েরা গান গাইবার ইচ্ছের সাথে লজ্জা মিশিয়ে কেমন একটা আধো আধো পানসেপানা মুখ করে তা তোরা নিশ্চয়ই দেখেছিস।"

বৌদি বললেন, "অনেকদিন চর্চা নেই, তা বলছ যখন গাইবোঅখন দুয়েকটা।"

ততক্ষণে ভদ্রলোক এসে গেছেন, আমি বললাম, "আপনাকে কিন্তু দাদা আমাদের ফাংশনে প্রেসিডেণ্ট হতে হবে। আপনার মত প্রেসিডেণ্ট পেলে ক্লাব ধন্য হয়ে যাবে।" ভদ্রলোক হাত-টাত কচলে, একটু কড়ি-কাঠের দিকে তাকিয়ে রাজী হয়ে গেলেন।

আমি শুধোলাম, "ঝণ্টি বুঝি বাড়ি নেই?"

বৌদি বললেন, "থাকবে না কেন? দাঁড়াও ডাকছি। ও কিন্তু খুব ভাল আবৃত্তি করে।"

ঝণ্টি এলো। দেখলাম সঙ্গে ঘণ্টি নেই। আমি দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে, হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙলাম।

"সব বাজে কথা বলে যাচ্ছিস। এক্ষুনি বলবি আড়মোড়া ভাঙাটা দরকার ছিল।"

"ঠিক ধরেছিস কিন্তু।" বোয়াল বলে চলে—"ঝণ্টিকে বললাম আমাকে দুটো ছড়া শোনাবে?"

ঝণ্টি বললো, "বয়ে গেছে। তুমি আমাদের সব আম খেয়ে নাও। কিচ্ছু শোনাবো না তোমাকে।"

বৌদি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন "ছিঃ ঝণ্টি, শোনাতে হয়। তুমি এস ভাই ভেতরে এস।"

আমি বসবার ঘরে বসে, পুলকিত মা বাবার সামনে, সুন্দর মেয়েটার কতোগুলো মিষ্টি আবৃত্তি শুনে, 'ফাংশনে কিন্তু ওকে আবৃত্তি করতেই হবে বৌদি", বলে, বিদায় নিলাম। গেটের বাইরে সাইকেল রাখা ছিল। সাইকেল নিয়ে সোজা বুড়ো বটতলা। রাঘবটা ভূতের মতো চাদর মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওকে তুলে নিয়ে ঝড়ের মতন তোদের এখানে।"

"আরে আসল কথাটাই তো বললি না।"

"এটা, আরও বুঝিয়ে বলতে হবে? জানিসইতো রাঘবটা পাকা চোর। ওর কল্যাণে আমরা ডাব, কলা, মুরগী, পাঁঠা কি খাইনি বলতে

পারিস ? বেটা গাছে ওঠে বাঁদরের থেকেও ভালো, হাত চলে ম্যাজিসিয়ানের মতন। আড়মোড়া ভাঙাটা ছিল সিগন্যাল। ওটা দেখেই রাঘব পেয়ারা গাছ বেয়ে দোতলায়। কুকুরের মুখ চেপে চাদরের ভেতর সুড়ুৎ। তারপরেই বুড়ো বটতলা।"

রাঘবের দিকে তাকালাম। একমনে কুকুরটার সঙ্গে খেলা করছে। যেন বহুদিনের চেনা।

"তা কুকুরটা নিয়ে কি করবি ?" শুধোয় নয়ন।

বোয়াল নির্লিপ্ত গলায় উত্তর দিল, "রবিবার ভোরবেলা ওটাকে হাতিবাগানের হাটে বেচে আসবো। জাত অ্যালসেশিয়ন। কম করেও দুশো টাকা পাওয়া যাবেই।"

আমি বললাম, "দেখ আম, জাম, ডাব এসব চুরির আওতায় পড়ে কিনা ঠিক জানি না কিন্তু এটাতো একেবারে পাকা চুরি।"

বোয়ালের মুখটা বিষণ্ণ দেখালো—"এটা আমরা করতে চাইনি। কিন্তু বিশ্বাস কর আমি আর রাঘব সারাদিন ভেবেও আর কোনও রাস্তা পেলাম না। কতো লোকে জলের মত কতো টাকা ওড়াচ্ছে। রাঘবের এত বিপদে কেউ কি ওকে তার একটা ছোট্ট ভাগও দেবে ? না দেবে না। দুনিয়ার চেহারাটাই এমন। যদি কখনও সম্ভব হয় আমরা এটা ফেরত দিয়ে দেব।"

কুকুরটা কিন্তু দিব্যি আরামেই আছে। অনেক সাধাসাধিতে খানিকটা দুধ খেয়ে থলের ওপর ঘুমিয়ে পড়লো। আমরা ওটার গায়ে অন্য থলেটা চাপা দিয়ে দিলাম।

রাঘব আর বোয়াল যাবার সময় বলে গেল, "দেখবি, কেউ যেন জোর করে কিছু না খাওয়ায়।"

রাত্তিরে কুকুরটা মোটেই জ্বালায়নি শুধু মাঝে মাঝে একটু কুঁ-কুঁ-কুঁ করেছিল।

ভোর হতে না হতেই রাঘব এসে হাজির। হাতে একটা ঝোলায় দুধ। ঘণ্টি দুধের খানিকটা চক্‌চক্‌ করে খেলো আর বাকিটা ছড়ালো। রাঘব ঘণ্টিকে নিয়ে হস্টেলের ছাতে চলে গেল। বললো, "না হলে ঘর নোংরা করবে।"

* * *

বিকেলবেলা স্কুল থেকে ফিরেই দেখি, রাঘব বোয়াল অপেক্ষা করছে।

বোয়াল বললো—"কুকুরটাকে নিয়ে খুব হৈ চৈ পড়ে গেছে। ভদ্রলোকেরা কাছেপিঠে সব বাড়িতেই কুকুরটার খোঁজ করেছেন কিন্তু কেউই কিছু বলতে পারেনি।"

"তোদের সন্দেহ করেনি?"

"একদমই না। বরং আমাকে ডেকে ভদ্রমহিলা বলেছেন, "তুমি তো ভাই পাড়ার অনেক খোঁজ রাখো একটু দেখো না খুঁজে।"

রাঘব একটু দুঃখ প্রকাশ করছিল, "মুশকিল একটাই হয়েছে। ঝন্টি কুকুরটার জন্য বড্ড কাঁদছে। কাল থেকে আজ, এই এখন অবধি, মেয়েটা প্রায় কিছুই খায়নি। কাজটা বোধহয় না করলেই হত। মেয়েটার জন্যে মনটা বড় খারাপ লাগছে রে। ওর বাবা ওকে পুতুল কিনে দিয়েছে, চকোলেট দিয়েছে, বলেছে আরেকটা কুকুর কিনে দেবে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হবার না। ওর ঘন্টিকেই চাই।"

বোয়াল খেঁকিয়ে উঠলো—"না করলেই হ'ত, তো করলি কেন? টাকাটা না হলে তোর বাপটা যে চোখের ওপর মরে যাবে সে খেয়াল আছে? এতো দরদ, তো যানা, কুকুরটা ফেরত দিয়ে আয়।"

তোমরা যারা কখনও কুকুর পোষোনি তারা ভাবতেই পারবে না, একটা কুকুর ছানার জন্য আড়াই দিনে ঠিক কতোটা মায়া জন্মায়। আমাদের চার জনের, আড়াই দিনে কুকুর ছানাটার ওপর যা মায়া পড়ে গেল তা জড়ো করলে, সাতটা বড়ো বালতি আর দুটো চৌবাচ্চাতেও ধরবে না। মায়াগুলো যদি কুকুরটা আলমারিতে জমা করে রাখে তাহলে ওকে সারাজীবন অন্তত মায়ার জন্য আর ভাবতে হবে না।

রবিবার ভোর সাড়ে পাঁচটায় রাঘব আর বোয়াল ঘন্টিকে নিতে এলো।

কুকুরটাকে আমি শেষ দুধ খাইয়ে দিলাম। এক মাইল হেঁটে গিয়ে ওরা প্রথম ট্রেনটা ধরবে। এতো ভোরে, বাসের ঠিক থাকে না। উল্টো-ডাঙা স্টেশনে নেমে একটু হাঁটলেই হাতিবাগানের হাট। রাঘব ওর চাদরের ভেতর পুরে ফেলল ঘণ্টিকে। ওরা চলে যাওয়ার পর আমি আর নয়ন কেউই কোনও কথা বললাম না। মনটা বেশ খারাপ লাগছিল।

সব ঠিক ঠাক চললে রাঘব, বোয়ালের ফেরার কথা দেড়টা নাগাদ। কিন্তু বিকেল গড়িয়ে গেল, তখনও ওরা ফিরলো না। আমি আর নয়ন অনেক জল্পনা-কল্পনা করলাম। কি হতে পারে? পুলিসে ধরলো? পথ হারালো? না অন্য কিছু।

রাঘব আর বোয়াল ফিরলো, সন্ধে তখন সাতটা। আমি প্রথমেই দেখে নিলাম কুকুরটা সঙ্গে আছে কিনা? না নেই।

"এতো দেরী হ'ল যে?"

"বিক্রী করেছিস?"

আমি আর নয়ন এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

রাঘব আর বোয়ালের মুখে পরিতৃপ্তির হাসি।

"দাঁড়া একটু জিরিয়ে নি", বললো বোয়াল।

রাঘব আবার পরিতৃপ্তির হাসি হাসলো। "বেচে দিয়েছি। পাক্কা আড়াইশো।"

বোয়াল খিঁচিয়ে উঠলো। "আমাকে সবটা বলতে দে, তুই গুবলেট করবি।"

"ফাঁকা ট্রেনে শীতের ভোরের হাওয়া হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। ঘণ্টি বেশ মজায় ছিল রাঘবের চাদরে। মাঝে মাঝে কুঁ, কুঁ, কুঁ করছিল। আমাদের কিন্তু বেশ মন খারাপ লাগছিল জানিস। আমার আর রাঘবের। অনেকবার ভাবলাম কি করবো? বেচবো না ফিরে আসব? শেষে ঠিক করলাম আড়াইশো টাকা না পেলে বেচবো না।

হাতিবাগানের হাটে পেঁছুলাম তখন সাড়ে সাতটা। কুকুর বগলে দাঁড়িয়ে আছি তো আছিই। খদ্দেরের পাত্তা নেই। আশেপাশে আরও কতো লোক কতো কি এনেছে বিক্রীর জন্য। কুকুর, পাখি, খরগোস, গিনিপিগ এমনকি রাজহাঁস পর্যন্ত। অন্য সবই বিক্রী হচ্ছে পটাপট কিন্তু কুকুরের খদ্দের নেই। পাশে একটা লোক ছিল, যে এই কুকুর

বিক্রীর কারবার করছে কুড়ি বছর। সে বললো "ওর ঠিক নেই ভাই। যখন আসবে না, একটাও আসবে না কিন্তু যখন আসতে শুরু করবে, তখন সামলাতে পারবে না।"

আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে, উত্তরা সিনেমার উল্টো-দিকে, ট্রাম লাইনের ধারে, এক রকম রাস্তার ওপরেই। বেশীক্ষণ কুকুর বগলে দাঁড়িয়ে থাকলে বোধ হয় লোকে দার্শনিক হয়ে ওঠে। রাঘব আমায় দেখালো রাস্তায় অনেকগুলো কুকুরছানা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কয়েকটা ঘণ্টির মতই দেখতে।

আমি বললাম "এগুলোই ভালো আছে, বুঝলি। স্বাধীন জীবন অনেক বেশী সুখের। নিজের ইচ্ছে মত চলতে পারবে, খেতে পারবে। ঘণ্টিকে যেই কিনুক না কেন ওর গলায় বকলস পড়বেই।"

আরো সাত পাঁচ ভাবছিলাম কিন্তু আমাদের প্রথম খদ্দেরের প্রশ্নয় চিন্তাধারায় ছেদ পড়লো।

"কতো দাম হে?" সামনে একটা রোগা লম্বা ছিটকিনির মত লোক।

"সাড়ে চারশো।" বলেই আমরা লেগে গেলাম ঘণ্টির গুণপনার বর্ণনা দিতে। গল্পগুলো আগেই ঠিক করা ছিল। তার প্রেসি করলে এই রকম দাঁড়ায়। ঘন্টির বাবা একবার বাঘের মুখ থেকে একটা শিশুকে বাঁচিয়েছিল। আর ঘণ্টির মা একটা ডাকাতের রিভলবার শুদ্ধ হাত চিবিয়ে দিয়েছিল, তাতে মালিকের দু লক্ষ টাকার সম্পত্তি বেঁচে যায়। এ ছাড়া আমরা ঘণ্টির মা বাবাকে এতো বড়ো দেখতে করেছিলাম যাতে সকলের তাক্ লেগে যায়। একটা রেলগাড়ির ইঞ্জিনের সামনে কুকুরের মাথা আর শেষে লেজ লাগালেই শুধ সেরকমটা হওয়া সম্ভব। অনেক খদ্দের এলো কিন্তু কেউই দুশোর বেশী উঠলো না।

একটা যখন প্রায় বেজে গেছে, হাট ভাঙতে শুরু করেছে, তখনই হঠাৎ একটা ঢাউস গাড়ি আমাদের প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে ঘ্যাঁচ করে থামলো। আমরা ড্রাইভারকে গালাগাল করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই একটা সাজগোজ করা, খোঁপা বাঁধা মুখ পেছনের জানলা দিয়ে বেরিয়ে এলো।

"কতো দাম অ্যালসেশিয়নটার?" ভদ্রমহিলা নেমে পড়লেন গাড়িথেকে।

আমি বললাম, "পাঁচশো।"

রাঘব ঘণ্টির গল্পগুলো আরম্ভ করতেই ভদ্রমহিলা ধমক দিলেন, "আঃ! আমাকে কুকুর চিনিও না।"

আমরা কথা শুনলাম। আর চেনানোর চেষ্টা করলাম না।

ভদ্রমহিলা বললেন, "কুকুরটা খুব ভালো জাতের। এতোটা ভালো চট করে দেখা যায় না। আমি এরকমই একটা খুঁজছি। যেতে যেতে হঠাৎ নজর পড়ে গেল। এক নজরেই চিনেছি। ক'টা কুকুর আছে জানো আমার ?"

আমরা কানটান চুলকে ভদ্রতার খাতিরে জিজ্ঞেস করলাম, "ক'টা ?"

"বলব কেন ?" বলে ভদ্রমহিলা একটা অদ্ভুত মুখ করলেন।

আমরা ভীষণ থতমত খেয়ে গেলাম।

ভদ্রমহিলা মুচ্‌কি হাসলেন, "কুকুরটা ভালো ঠিকই, কিন্তু দাম বড্ড বেশী বলছ।

দরাদরি করবো না, যদি আড়াইশোয় হয় তো দিয়ে দাও।"

রাঘব আর আমি একটু দূরে সরে দাঁড়ালাম। রাঘব বলল, "কি করবি ? ঝিণ্টির মুখটা কিন্তু বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে। অতো সুন্দর মেয়েটা দুদিনে আধখানা হয়ে গেছে।"

আমি ঝাঁঝিয়ে উঠলাম—"আর তোর বাবার মুখটা মনে পড়ছে না ?"

"হ্যাঁ পড়ছে।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রাঘব।

আমি রাঘবকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলাম, "দেখ কথা ইজ্ কথা। ঠিকই তো ছিল আড়াইশো পেলে বেচে দেব।"

আমরা একটু দরাদরির চেষ্টা করলাম, "শুধু টাকার জন্যই বেচতে হচ্ছে। যদি পঞ্চাশটা টাকা বাড়াতেন—ইত্যাদি।"

ভদ্রমহিলা অনড়। আমাদের হাতে গুনে গুনে আড়াইশোটা টাকা দিয়ে কুকুরটাকে নিজের পাশে বসালেন গাড়িতে। ঠিক তখনই আমরা প্রথম উপলব্ধি করলাম ঝিণ্টিই শুধু না, আমরাও কি সাংঘাতিক ভালোবেসে ফেলেছি ঘণ্টিকে।

গাড়িটা ছেড়ে দিতেই আমি একটা দরকারী কথা বলার জন্য গাড়ির সঙ্গে দৌড়োলাম। আমাকে দেখে গাড়িটা থেমে গেল। এদিকের জানলা দিয়ে ভদ্রমহিলাকে বললাম, "ও কিন্তু জন্মে থেকে দুধ ছাড়া কিছুই খায়নি, ওকে……"

রাঘবও আমার সাথেই দৌড়েছিল। ওপাশের জানলা দিয়ে ঘণ্টিকে শেষ আদর করে নিচ্ছে।

সত্যি চটে উঠলেন ভদ্রমহিলা। মাথাটা বেরিয়ে এলো জানলা

দিয়ে। "বলেছি না আমাকে কুকুর নিয়ে জ্ঞান দেবে না। ক'টা কুকুর দেখেছো হে ?"

গাড়িটা ছেড়ে দিল। আমরা খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে একটা ফাঁকা ৭৮বি বাসে চেপে বসলাম। জানলার পাশের সিটে বেশ সুন্দর দুপুরের হাওয়া দিচ্ছে। আমাদের মেজাজ খারাপ। কোনও কথা নেই। তাকিয়ে আছি বাইরের দিকে।

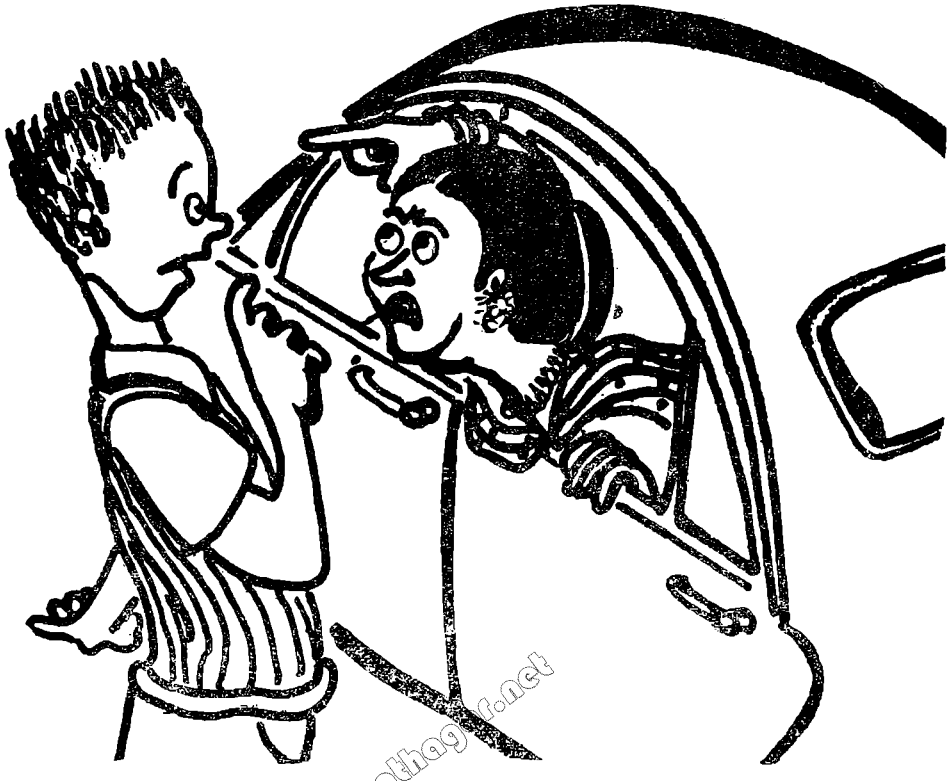

বাসটা সবে শ্যামবাজার পেরিয়ে বি. টি. রোড ধরেছে, হঠাৎ কুঁ-কুঁ-কুঁ। ঘণ্টির ডাকটা কানে বাজছে মনে হল। কিন্তু দু মিনিট না যেতেই ও কি! আবার কুঁ-কুঁ-কুঁ। আমি রাঘবের দিকে তাকালাম।

রাঘব একটু লজ্জিত মুখ করলো। "কিছু মনে করিস না," বলেই গায়ের চাদরটা খুলে ফেললো।

আমি এতো আশ্চর্য জীবনে কখনও হইনি। রাঘবের কোলে পরম নিশ্চিন্তে বসে আছে ঘণ্টি।

আমি রাঘবকে একবাস লোকের মাঝে জড়িয়ে ধরলাম "পাল্টে দিয়েছিস ?"

"হ্যাঁ। ওখানে যেগুলো ঘুরছিল…"

"কখন ?"

"তোর কি দরকার ? উনি তো কুকুর চেনেন। দেখেই নিয়েছেন।"

আমি আর নয়ন এতক্ষণ হাঁ করে শুনছিলাম, আমরা লাফিয়ে উঠলাম।

বোয়াল বললো, "আমি আগেই বলেছিলাম না ব্যাটা পাক্কা চোর।"

নয়ন শুধোল, "তা ঘণ্টি গেল কোথায় ?"

"ফিরিয়ে দিয়ে এসেছি ঝণ্টির কাছে।" বললো রাঘব। "ঘণ্টিকে উদ্ধার করার যা দুঃসাহসিক সব গল্প বলেছি। দুটো এভারেস্ট ডিঙোনো বা তিনটে অ্যাটলাণ্টিক পেরোনো তার কাছে কিছুই না। ঘণ্টিকে পেয়ে ঝণ্টির যে কি আনন্দ হয়েছে তা বলে বোঝানো সম্ভব না। ওখানেই তো দেরী হয়ে গেল। ভদ্রমহিলা খাইয়েছেনই শুধু না আমাদের গল্পের বই কেনার জন্য তিরিশটা টাকাও দিয়েছেন।"

আমি বল্লাম, "দুশো আশি হল, আমাদের যা আছে মেলালে পাক্কা তিনশো হবে। আমাদের টাকা নিবি না ?"

রাঘব বললো, "একশোবার নেবো।"

pathagar.net

pathagar.net

## "দাঁতের মাজন ঝক্‌মকি"

শীতের সকাল। দিব্যি লেপমুড়ি দিয়ে সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখছিলাম। ছোটমামার বাড়ি নেমন্তন্ন। মামীমা টেবিলে মুরগীর মাংস আর লুচি সাজিয়ে দিয়েছেন, মুরগীর ঠ্যাঙে সবে একটা কামড়

বসাতে যাব, হঠাৎ একটা বদ্‌খত্‌ চিৎকারে ঠ্যাং, ট্যাং কোথায় হাওয়া হয়ে গেল।

"এই পানু···পানু···কি করছিস রে ? এখনো ঘুমোচ্ছিস নাকি ?" চোখ খুলে দেখি নিমে হৈ হৈ করে ঘরে ঢুকে পড়েছে। স্বপ্নটা এমন জোরালো ছিল যে আরেকটু হলেই বলে ফেলছিলুম, "কি আবার করবো মুরগীর ঠ্যাং চিবোচ্ছি।" কোনরকমে সামলে নিলাম। মেজাজটা একদম খিঁচড়ে গেল। অমন মুরগীর ঠ্যাংটা···।

নিমে, মানে নিমাই, আমার ইস্কুলের বন্ধু। খু-ব বন্ধু, যাকে বলে একেবারে প্রাণের বন্ধু। আমরা একসঙ্গে পড়েছি, ক্লাসে আর ফুটবলের মাঠে। একসঙ্গে ঘুমন্ত সংস্কৃত স্যারের টিকিতে ফুল বেঁধেছি, একসঙ্গে নিলডাউন হয়েছি, একসঙ্গে জাম পাড়তে গিয়ে পিঁপড়ের কামড় খেয়েছি। মাত্র চার নম্বরের জন্য বিরাট ফারাক হয়ে গেল, যখন উচ্চমাধ্যমিকে আমি পাস করলাম দু নম্বরের জন্য আর নিমে পাশ করল না, দু নম্বরের জন্য। নিমে পষ্ট জানিয়ে দিল যে সে আর ওসব পড়াশোনার ঝামেলায় থাকবে না। আমি ওকে অনেক বুঝিয়েছিলাম যে অন্তত সাত-আটবারের আগে হালছাড়ার কোন মানেই হয় না। নিমে শোনে নি। তার মতে বড় মানুষ, মানে মনীষীরা কেউ পাশ করে না। আমি পাশ করে গেছি যখন, তখন আমার আর মনীষী হবার কোন আশাই নেই। নিমে বারবার পাশের চেষ্টা করার চেয়ে মনীষী হবার চেষ্টাই করবে। তারপর থেকেই নিমে হাওয়া। পাক্কা তিনবছর তার পাত্তা নেই। শুনেছিলাম নিমে তার কোন এক মামার কাছে চলে গেছে বম্বেতে।

দেখলাম বম্বেতে থেকে নিমাইয়ের চেহারা বেশ বম্বেটেপানা হয়েছে। ইয়া গোঁফ, ইয়া দাড়ি, গায়ে চামড়ার জ্যাকেট, ঠিক যেমনটি বম্বের ফিল্মে দেখা যায়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "সদ্য বম্বে থেকে এলি বুঝি ?"

নিমে একটু লজ্জায় পড়লো, "এসেছি বছর খানেক আগে। তোর সঙ্গে দেখা করা হয়নি। বড় ব্যস্ত থাকতে হয় কি না। আমরা এখন আর এখানে থাকি না। বেহালায় উঠে গেছি। বাবা বাড়ি করেছে।"

"কি করছিস এখন ?"

"একটা কস্‌মেটিক, মানে প্রসাধনের ব্যবসা করছি। সেই ব্যাপারেই তুই একটু জরুরী কনসাল্ট্‌ হবি।"

প্রথমটা আমি একটু থতমত খেয়েছিলাম কিন্তু পরক্ষণেই বুঝলাম

যে বাংলার নিমাই অনেক পাল্টেছে, কিন্তু ইংরিজীর নিমাই অর্থাৎ নিমাইয়ের ইংরিজি একই আছে। ও আমার সঙ্গে কিছু আলোচনা করতে চায়। যা ও চিরকাল করেছে।

নিমের কথা থেকে বোঝা গেল যে সে দেশে চুটিয়ে কস্‌মেটিকের ব্যবসা করছে। এছাড়া ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট তো আছেই। দুবছর বম্বেতে কাটিয়ে বম্বের নামকরা প্রাফেসারের ফারমুলা সে হাতিয়েছে। তাইতেই এই পসার। উচ্চারণগুলো অবশ্য হিন্দি ফিল্মি কায়দায় নিমের। নিমে সত্যিই মনীষী হতে চলেছে। আর আমি ? ফিলজফিতে বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে রেজাল্টের অপেক্ষায় ছমাস বসে আছি। রেজাল্ট যখন বেরোবে, মার্কশীটে দেখব বোটানিতে ফেল করেছি। নিমে ঠিকই বলেছিল, "পাস করতে গেলে আর মনীষী হওয়া যায় না।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "দিব্যি তো মনীষী হবার পথে এগিয়েছিস, আমার সঙ্গে কি জরুরী কনসাল্ট হবি ?"

নিমে একটু লজ্জা পেল, "একটা ভাল বিজ্ঞাপন দরকার। আমি তোকে ছাড়া বিশেষ কাউকে চিনি না যে উচ্চ মাধ্যমিকের গণ্ডী পেরিয়েছে। তাই…"

"কি ধরনের বিজ্ঞাপন দরকার ?"

"দেখ্‌, আমরা একটা নতুন মাজন বার করেছি", নিমে ব্যাগ থেকে একটা টিউব্‌ বার করলো। "মাজনটার নাম ঝক্‌মকি। তুই কি জানিস বাজারের সবকিছু বিজ্ঞাপনে কাটে ?"

আমি বাধা দিয়ে উঠলাম, "বিজ্ঞাপনে নয় ভাই, পণেও কাটে। মেয়েরা যে বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়ি কেটে পড়ে তা শুধু পণের জোরেই তো।"…

"আমি সে কাটার কথা বলিনি, বলছিলাম বিক্রীর কথা" মুখটা একটু বিকৃত করল নিমে। "বাতের তেল, টাকের তেল, রেড়ীর তেল, গাড়ীর তেল, মাদুলি, আধুলি সবই বিক্রী হয় বিজ্ঞাপনে।"

"তা অবশ্য ঠিকই", আমি সম্মতি জানালাম। "তা আমাকে কি করতে হবে ?"

"তুই একটা এমন বিজ্ঞাপন লিখে দিবি যা পড়লে লোকে অন্যসব মাজন ছেড়ে ঝক্‌মকির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আজকাল বিজ্ঞাপনে খুব ছড়া চলছে, জুতসই একটা ছড়া হলে তো আর কথাই নেই।"

pathagar.net

"দেখ, আমার ছড়া সম্বন্ধে জ্ঞান খুবই কম। কলার সঙ্গে ছড়ার একটা সম্পর্ক আছে এইটুকু জানি।"

হা-হা করে হেসে ওঠে নিমে—"ঠিক বলেছিস্, ছড়াও এক ধরনের কলা।"

আমি বললাম, "এটা আমার জানা ছিল না, আমি শুধু মর্তমান, সিঙ্গাপুরি এই রকম দুচারটের কথাই জানি।"

নিমে একটু কাষ্ঠহাসি হাসল, "সে কলার কথা বলছি না রে। কলাবিদ্যার কথা বলছি। গান, নাচ, আঁকা যেমন কলাবিদ্যা, ছড়াও তেমনি কলাবিদ্যার ভেতরেই পড়ে। ছড়া জানিস নে। সেই যে একরকম রচনা হয় না! ছোট ছোট লাইন, লাইনে লাইনে মিল। পড়তে বা শুনতে গেলে গায়ে বেশ একটা দুলুনি লাগে। দুলুনি থেকে ঢুলুনি। আমার একটা মনে আছে, শোনাচ্ছি তোকে—

'চাঁদ উঠেছে আকাশে
বোসো আমার বাঁপাশে···'

এইরকম আরো অনেক লাইন থাকে পর পর। মেলানো মেলানো।"

আমি বললাম, "এইরকম রচনা আমি প্রচুর দেখেছি বটে, তবে আমাদের গুষ্টিতে কেউ এরকম রচনা কখনও লেখেনি। গরু, ঘোড়া, উৎসব, উন্মাদ, উচ্ছে যে কোন কিছুর রচনা হৈ হৈ করে লিখে দেব। ভারি সহজ। তুই নিজেও পারবি। একটা ভাল রচনা বই থেকে একটা গরুর রচনা মুখস্থ ক'রে রাখবি, তারপর যে জিনিসের রচনা লিখতে চাস, গরু শব্দটার জায়গায় সেটা বসিয়ে দিবি। দেখবি চমৎকার হয়েছে। কি, দেব নাকি একখানা মাজনের রচনা লিখে?"

নিমের উৎসাহ দেখা গেল না। রচনায় হবে না, তার ছড়াই চাই বিজ্ঞাপনের জন্য। আমি ভাবনায় পড়লাম। বললাম, দাঁড়া ভাবি, কে তোকে রচনায় ছড়া লিখে দিতে পারবে?"

নিমে বলল, "রচনায় ছড়া নয়, ছড়ায় রচনা।"

অনেক ভেবে মনে পড়ল হরিহরবাবুর কথা। আমি লাফিয়ে উঠে বললাম, "পেয়ে গেছি রে, পেয়ে গেছি। তোর ছড়া আর কে আটকায়!!"

হরিহরবাবু পৈত্রিক বিজনেস দেখাশুনা করেন আর অবসর সময়ে (যেটা হরিহরবাবুর প্রচুর) ঠিক ওইরকম রচনা করেন—ছোট ছোট লাইন, মিলের পরে মিল, পড়তে পড়তে ঢুলুনি। মনে পড়ে গেল

পাড়ার সরস্বতী পুজোর বিচিত্রানুষ্ঠানের সময় পাড়ার অসভ্য কুকুর-গুলো কখনও ঘেউ ঘেউ, কখনও কেঁউ কেঁউ করছিল। কিন্তু হরিহর-বাবুর ছড়া পড়ার সময় সব চুপচাপ। তারা নিশ্চয়ই পালায়নি কারণ নিজের মহল্লায় কুকুররা বাঘের মতন। তাহলে তাদেব নিঘাত ঢুলুনিই এসেছিল।

নিমে লাফিয়ে উঠল, "এমন লোকই খুঁজছিলাম। তুই শুধু আলাপ করিয়ে দে। বাকীটা আমি বুঝবো।"

* * *

বিরাট বাড়ি হরিহরবাবুর। আমাদের ঢুকতে দেখেই, চাকর হরিহরবাবুকে ডাকতে গেল। একটু পরে হরিহরবাবু ঢুকলেন তেল মাখতে মাখতে। বিশাল টাক, তার চেয়ে বিশাল ভুঁড়ি, পরনে একটা ধুতি খাটো করে পরা, মুখ দেখলে মনে হয় তিন রাজ্যের অশান্তি জমা হয়েছে। একটু ফাটল পেলেই ঠিকরে বেরুবে।

আমি পরিচয় দিলাম, "আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি প্রাণেশ্বর, সেই যে সরস্বতী পুজো···। আপনার সাথে একটু দরকার ছিল।"

হরিহরবাবু অত্যন্ত গম্ভীর ও বিরক্তভাবে এক নিশ্বাসে বলে গেলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ চিনতে খুব পেরেছি, তুমি পেনো, কিন্তু এখন আমার একটুও সময় নেই, আপিস যেতে হবে বারোটার ভেতর। তাছাড়া আমার মাসতুতো ভাই মারা গেছে, আমাদের কালাশৌচ। এবছর চাঁদা, এড্‌ভার্টিজ্‌মেণ্ট সব দেওয়া বন্ধ, দ্‌ক্‌সিদ্ধান্ত মতে।"

আমি বিনীত গদগদ স্বরে বললাম, "না হরিদা আমাদের ওসব দরকার নেই, আমরা এসেছিলাম একটা ছড়ার জন্য।"

হরিহরবাবুর মুখটা হাঁ হয়ে গেল, চোখ দুটো হল গোল। আমি পষ্ট দেখলাম একটা মশা হরিহরবাবুর টাকের ওপর বসে সুখে রক্ত খাচ্ছে হরিহরবাবুর ভ্রুক্ষেপ নেই। পাক্কা এক মিনিট পরে তাঁর হাঁ বন্ধ হল, তিনি নিজের ভেতর ফিরে এসেই হুংকার ছাড়লেন, "ও গিন্নী, ও পাঁচুর মা, এ সুরুয়া সিং, ঘরমে অতিথি আয়া, কিসি কা হোঁশ নেহি?"

পাঁচুর মা আর সুরুয়া সিং দৌড়তে দৌড়তে হাজির হল। হরিবাবুকে কেমন নার্ভাস মনে হল। হরিবাবু হাঁকলেন, "পাঁচু সিং, তুম আভি ভীম নাগ সে বিশ রুপেয়া কা সন্দেশ লাও, আউর সুরুয়ার মা তুম্‌ আভি গিন্নীমা কো বোলো সরবৎ বানানে।"

সুরুয়া সিং দৌড়ল মিষ্টি আনতে আর পাঁচুর মা গেল গিন্নিমাকে খবর দিতে।

হরিবাবু বললেন, "বাবা প্রাণেশ্বর, ইটি কি তোমার বন্ধু ?"

বন্ধু নয়ত কি ? আমার ভীষণ রাগ হ'ল, বলেই ফেলেছিলাম, "একে কি আমার সেজ পিসিমা বলে মনে হয় ?" কিন্তু ছড়া বাগানোর ধান্ধায় চেপে গিয়ে বললাম, "এটি আমার বন্ধু নিমাই দাস। বিশাল বিজনেস্‌ম্যান্‌। আপনার কাছে এসেছিল বিজ্ঞাপনের জন্য একটা ছড়া নিতে। তা আপনার সময় নেই, আমরা বরং আর কারো কাছে যাই।"

হরিবাবু প্রায় আর্তনাদ ক'রে উঠলেন, "না না আমার শরীরটা কদিন বেশ খারাপ চলছে, আজ এমনিই ভাবছিলাম আপিসে যাবো না। ভালোই হ'ল তোমাদের পেয়ে। সকালটা গল্প করে কাটবে।"

সুযোগ পাছে হাতছাড়া হয় সেই ভয়ে নিমে নিজেই এগিয়ে গেল, "আমরা জানি আপনি খুব সুন্দর ছড়ায় রচনা লেখেন তাই…"

হরিবাবু অস্বাভাবিক লজ্জিত ভাবে হাত কচলাতে থাকলেন। আমার মনে হ'ল ওনার হাতের ছাল উঠে যাবে। পষ্ট দেখলাম আবার একটা মশা হরিবাবুর টাক থেকে একমনে রক্ত খাচ্ছে, আবার হরিবাবুর ভ্রূক্ষেপ নেই।

প্রাথমিক কিছু কথাবার্তা আরম্ভ হতেই দেখি সুরুয়া সিং-এর সন্দেশ ভর্তি প্লেট আমাদের সামনে হাজির হয়েছে। হরিবাবুর গিন্নি পাঁচুর মার হাত দিয়ে পাঠিয়েছেন ম্যাংগো সিরাপ দেওয়া সরবৎ। চার পাঁচ রকমের সন্দেশ। ওদের সন্দেশের দিকে নজর নেই। হরিবাবুর ডাইবিটিস্‌, মিষ্টি খাওয়া বারণ আর নিমে উন্মত্তভাবে হরিবাবুকে বুঝিয়ে যাচ্ছে তার ছড়ানো বিজ্ঞাপনের হরেক ফিরিস্তি। সন্দেশরা চেয়ে আছে আমার দিকে, আমি চেয়ে আছি ওদের দিকে, আর থেকে থেকেই সন্দেশ চালান করছি আমার গালে। কখনো সরবৎ দিয়ে সন্দেশ ভিজিয়ে, কখনো সন্দেশ দিয়ে সরবৎ শুক্‌নো ক'রে। অতিথির ভদ্রতা রাখতেই হয়। সন্দেশ ভেসে যাচ্ছে আমার গলায় আর ওদের কথাবার্তা ভেসে আসছে আমার কানে।

নিমে বলছিল, "বিজ্ঞাপনটা এমন হবে যে সবাই বুঝবে মাজনটা বহুদিন থেকে চলে আসছে। বোঝাতে হবে পৃথিবীর সর্বত্র, সব

জাতির ভেতর মাজনটার চলের কথা। লাইনে লাইনে থাকবে মিল আর চমক্। এটা হোল চমক্-এর বাজার, বুঝলেন না···। হ্যাঁ, আরেকটা কথা। কিছু অতিরিক্ত গুণাবলীর কথা জুড়ে দিতে পারেন যেমন যেমন পছন্দ। মানুষের স্বভাব তো জানেনই, আসলের থেকে ফাউয়ের দিকে বেশী নজর। ধরুন আপনি এক প্যাকেট চুনকে সাবান ব'লে বেচতে চান। কি করবেন বলুন তো ?"

হরিবাবু মাথা চুলকোলেন, ঘাড় চুলকোলেন, কড়িকাঠের দিকে তাকালেন। মুখে একটা চোর চোর ভাব। যেন উত্তরটা ওঁর জানা একশবার উচিত ছিল।

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, "একটা সন্দেশ খা নিমে", কিন্তু "সন্দেশ" এর বেশী পেঁছিন গেল না, নিমে হৈ হৈ ক'রে উঠল, "ঠিক ধরেছিস, একটা সন্দেশ হোক্, আলুর চপ হোক্, চামচ, গেলাস, ছুরি, পুরী, যা খুশী হোক্ ফ্রীতে দিয়ে দাও, ব্যস !! দেখবে তোমার চুনের প্যাকেট সব ভালো সাবানের প্যাকেটের মুখ চুন করে দিয়েছে। অবশ্য অতিরিক্ত গুণাবলীও একই কাজ করে। ট্রেনে পেন বিক্রী করতে দেখেননি হকারদের ? দেখলে বুঝতেন একটা পেন দিয়ে কত কিছু করা যায়। সব্বার পরে আসে, লেখার কথাটা।"

ততক্ষণে হরিবাবুর মুখটা আবার উৎফুল্ল হয়েছে। মনে হ'ল তিনি বিজ্ঞাপনের ছড়ার সারমর্ম ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছেন। একটু জোরে জোরে পায়চারি ক'রে হরিবাবু বললেন, "দুদিন পরে আসুন আমি লিখে রাখব।"

নিমে ব্যাগ থেকে দুটো মাজনের টিউব হরিবাবুর হাতে দিয়ে বললে, "এই দুটো একটু ব্যবহার করলে বাকি গুণাগুণগুলো জেনে যাবেন। আ···র" বলে নিমে একটা বড়ো হাঁ করলো, আমি শেষ সন্দেশটা নিমের হাঁয়ে গুঁজে দিয়ে বললাম, "অনেক বকেছিস, এবার চল। ওনাকে ভাবতে দে।"

pathagar.net

* * *

দুদিন পরে ঠিক সন্ধে সাতটার সময় আমি আর নিমে হাজির হলাম হরিবাবুর বাড়ি। আমরা হরিবাবুকে দেখে একেবারে তাজ্জব। কে বলবে ইনিই সেই দুদিন আগের আটহাতি কাপড় পরা, ভুঁড়ি বার করা, তেল মাখা হরিবাবু। ধোপ ভাঙা কোঁচানো ধুতি, সাথে গরদের পাঞ্জাবি, একদিকের চুল তুলে এনে টাকের ওপর তেল দিয়ে লেপ্টে

দেওয়া, মুখে পাউডার, ভুরভুর করছে সেন্টের গন্ধ। আমরা ঢুকতেই সুরুয়া সিং ইয়া এক সেলাম হাঁকালো। আমি আর নিমে বিব্রত হলাম। হরিবাবু নিশ্চয় বেরুচ্ছেন, কোন কবি সম্মেলন টম্মেলনে হবেও বা। সেন্টের সাথে ভুরভুর করে কেমন একটা কবি কবি ভাবও বেরুচ্ছে। নিমে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি বেরোচ্ছেন বোধহয়, জরুরী দরকারে, আমরা বরং আরেকদিন আসবো।"

হরিবাবু হাঁ হাঁ ক'রে বললেন, "না না আমি তোমাদের অপেক্ষাতেই আছি।"

নিমে একটু হাত কচলে, পায়ের বুড়ো আঙুল ঘসটালো, "ছড়াটা কি হয়ে গেছে ?"

হরিবাবু একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন, "বলেই তো ছিলাম হয়ে যাবে !"

আমি আর নিমে উসখুস করছিলাম শোনার জন্য। হরিবাবু নিমেকে বললেন, "আমি সবকটা পয়েণ্ট কভার করার চেষ্টা করেছি। বিজ্ঞাপনের ছড়াটা আস্তে আস্তে পড়ছি, তোমাদের খট্‌কা লাগলে বা আলোচনার কিছু থাকলে বলতে দ্বিধা কোর না।"

"দাঁতের মাজন ঝক্‌মকি
চম্‌কায় দাঁত চক্‌মকি।
রবিন হুডের মামা "জন"
লাগাতেন রোজ এ মাজন।"

পাঁচুর মা গরম গরম হিং-এর কচুরী আর মিষ্টি নিয়ে ঢুকলো। আমার আর নিমের মুখ উদ্ভাসিত। নিমের, ছড়া শুনে, আর আমার, কচুরী পেয়ে।

হরিবাবু বললেন, "দেখেছো, একটা লাইনে বুঝিয়ে দিয়েছি মাজনটা বহুদিন থেকে বিদেশে প্রচলিত, সেই রবিন হুডের আমলেরও আগে থেকে। আরে বিদেশে কদর না থাকলে এদেশে কেউ দাম দেবে না।"

আমি একটু আপত্তি করলাম, "রবিন হুডের বইয়ে লিট্‌ল্‌ জন ছিল ঠিকই কিন্তু সে কি রবিন হুডের মামা ?"

হরিবাবু হাসলেন, "কি আসে যায়। ইংলণ্ডে প্রতি তৃতীয় লোকের নাম জন। তাদের ভেতর কেউ না কেউ রবিনহুডের মামা ছিলই। কোথাও লেখা আছে দেখাতে পার, জন নামে রবিনহুডের কোনও মামা ছিল না।"

নিমেও ঝাঁঝিয়ে উঠল, "শুধু তাই-ই নয় হরিদা জনটা ডাকনামও হতে পারে। জনার্দন, জনমেজয়, জনকরাজা সকলেরই ডাকনাম জন ছিল। খাসা হয়েছে। আপনি পড়ে যান তো। পেনোটার কথায় কান দেবেন না। পড়াশুনা ক'রে ক'রে ওটা গোল্লায় গেছে।

হরিবাবু প্রবল উৎসাহে পড়তে থাকলেন—

"এনাকোণ্ডা এমাজনে
মাজতেন দাঁত এমাজনে।
অর্জুন দ্রোণ বেদব্যাস
এমাজনেই ছিলোভ্যাস।

নিমে আপত্তি করে উঠল, "একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না? এনাকোণ্ডার মতন মহাদেশ, মানে মহাদেশের সব লোক, এই মাজন ব্যবহার করত বললে একটু মিথ্যে শোনাবে না কি?

হরিবাবু আবার তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন, "এনাকোণ্ডা মহাদেশ কেন হবে? এনাকোণ্ডা তো মহাসাপ। থাকে এমাজন নদীতে।"

নিমে বলল, "আমি যতদূর জানি ইংরাজী A দিয়ে শুরু আর A দিয়ে শেষ হলে মহাদেশের নামই হয়। যেমন—এশিয়া, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া···কিরে হয় না?"

আমি মুখের ভেতর একসঙ্গে দুটো কচুরি পুরে দিয়ে মুখ রক্ষা করলাম। এনাকোণ্ডা আমার কাছেও নতুন। কি আসে যায় এনাকোণ্ডা সাপ না ব্যাঙের ছাতা তাতে? হিসেব পষ্ট। হরিবাবুর ছড়া, নিমের বিজ্ঞাপন আর আমার কচুরি।

নিমে বলল, "পরের লাইনগুলো কিন্তু সাংঘাতিক ভালো। বেদব্যাস তো সাধু ছিলেন, মহাভারত লিখেছেন, কিন্তু ছিলোভ্যাসও কি সাধু? উনি কি এমাজন নদীতেই থাকতেন আর লিখতেন? উপনিষদ টুপনিষদ ওঁরই লেখা বোধ হয়?

আর তাচ্ছিল্যের হাসি নয়, হা হা করে হেসে উঠলেন হরিবাবু, "আরে বাবা ছিলোভ্যাস মোটেই সাধু নয়। ছিল আর অভ্যাসের অসাধু সন্ধিই ছিলোভ্যাস, আর এখানে, এই মাজনে থেকেই এমাজনে। নদীটদি মোটেই নয়।

নিমে একটু চিন্তা করল, তারপর হাসিতে ফেটে পড়ে আর কি। "দারুণ দিয়েছেন দাদা একেবারে দারুণ। একটা অসাধুকে সাধু বানিয়ে দিলেন লেখার প্যাঁচে। বেড়ে হয়েছে, চালিয়ে যান।"

হরিবাবু পড়তে লাগলেন,—

"নড়বড়ে দাঁত শক্ত হয়,
মাজলে কেবল দিনটি ছয়।
ঝক্‌মকিটা আজ লাগালে,
কামড়াবে কাল ষাঁড়ের গালে।
বাঘ, সিংহ, চন্দ্রবোড়া,
লাগান রোজ এই মাজন থোড়া।
লাগিয়ে হাতি এক গাড়ী,
করলেন দাঁত এই ধাড়ী।"

হরিবাবুর অট্টহাস্যে নিমে কেমন ঝিমিয়ে পড়েছিল। ওর মুখ দেখে মনে হল কিছু বলবে কিনা ভাবছে। আমি একটা কচুরির ফাঁকে

হরিবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি এত গাল থাকতে ষাঁড়ের গালই বাছলেন কেন?

হরিবাবু হাসলেন, "ষাঁড়ই হল বলের প্রতীক, বুঝলে? বল আর বুল একই কথা। দাঁতের বল ষাঁড়ের অর্থাৎ বুলের গালে দেখাবে না তো কি ইঁদুরের গালে দেখাবে?"

নিমে একটু ক্ষীণ প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল, "বেশী লাগালে হাতির মতন দাঁত হবে এটা কি ভাল কথা ?"

হরিবাবু এতক্ষণে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন। "দেখো, এই জায়গাটায় একটু অলঙ্কার দেওয়া হয়েছে। বাঘ, সিংহ, হাতি কি আর সত্যি সত্যিই ঝকমকিতে দাঁত মাজে ? আসলে বোঝান হয়েছে যে এই মাজন লাগালে দাঁত ওদের মত শক্ত হবে। বাড়াবাড়ি কোন ব্যাপারেই ভাল নয় সে তো জানাই আছে, তা সে দাঁতের মাজনই হোক আর শিবের গাজনই হোক। কিন্তু একটা ব্যাপার কি পরিষ্কার হচ্ছে না, যে ঝকমকি বেশী লাগালে দাঁত বেশী শক্ত হবে ? তারপরে শোনো।"

পাঁচুর মা চা নিয়ে ঢুকলো। হরিবাবু ছড়ার খাতাটি নামিয়ে রাখলেন। যেন ইণ্টারভ্যাল হোল। কচুরির যা অবশিষ্ট ছিল নিমে

আর হরিবাবু ভাগাভাগি করে খেয়ে নিল। বেশী খাটতে হল না কারণ মাত্র কয়েকটাই আমি অনেক খেটেখুটে রেখেছিলাম।

ইণ্টারভ্যাল শেষ।

হরিবাবু আবার খাতা নাকের কাছে তুললেন, "তুমি সেদিন দু টিউব মাজন দিয়ে গিয়ে খুব ভালো করেছিলে। তাইতো ওর অতিরিক্ত

গুণাগুণগুলো মানে ফাউগুলো জানা গেল। আর পটাপট ছড়ায় ঢুকিয়ে দিলাম।" নিমের মুখ দেখে বুঝলাম উত্তেজনায় ভুগছে, অতিরিক্ত গুণগুলো জানার জন্য।

হরিবাবু বলে চললেন, "আমার ছোট ছেলে ঘণ্টা সেদিন আঠার টিউবের বদলে ভুল করে ঝক্‌মকির টিউব থেকে ঘুড়ি জুড়েছিল। বলব কি ভাই দারুণ আঠা, ঘুড়ির অন্যান্য সব জায়গা ফেঁসে গেল শুধু ঐ জায়গাটা ছাড়া। ঘণ্টা তো কিছুতেই টিউবটা ফেরত দেবে না। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে একটা লাট্টুর লোভ দেখিয়ে, তবে ওর হাত থেকে ঝক্‌মকিকে উদ্ধার করা গেল। দারণ জিনিস হে ; বাংলায় যাকে বলে ফ্যান্‌টাস্‌টিক। আরো গুণের কথা শুনবে ?"

নিমের মুখটা দেখার মত হল। শোনবার আগ্রহও আছে আবার কি শুনবে সে সম্বন্ধে শঙ্কাও প্রচুর।

হরিবাবু বলে চললেন—"আমাদের ঠাকুর ঘরটা ছাদে। রোজ সকালে ঠাকুরকে মিষ্টি দিয়ে একটু আড়ালে যাওয়ার অপেক্ষা। মুহূর্তে সব ধরনের টিকটিকি, গিরগিটি, আরশোলা আর ইঁদুরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ঠাকুরের মিষ্টি ফাঁক করে দেয়। বেচারা পিঁপড়েগুলো রসের বেশী কিছুই পায় না। ভারি উপদ্রব ছিল ভাই এতদিন। সেদিন ঘণ্টা, ঠাকুর ঘরের এদিকটায় বসে ঘুড়ি জুড়তে গিয়ে কিছুটা ঝক্‌মকি এদিক ওদিক ছড়িয়েছিল। বলবো কি, তারপর থেকেই আপদগুলো সব পালিয়েছে। ঠাকুরের মিষ্টি সারারাত পড়ে থাকলেও কোন হেরফের নেই। ভাগ্যিস তুমি বুদ্ধি ক'রে টিউব দুটো দিয়েছিলে তাই তো এই গুণাগুণগুলো জানা গেল।

"রাখবে সকল পরিস্কার,
করবে আপদ বহিস্কার,
টিকটিকি, কাক, আরশোলায়,
ঝক্‌মকিটার ভয়ে পালায়।"

আমরা কোন প্রতিবাদ করলাম না, ছড়া চলতে থাকল। নিমের মনের ভাবটা ঠিক বোঝা গেল না।

"মাজন হলেও জোর আঠা,
জুড়বে ঘুড়ি, গোঁফছাঁটা।
আজই কিনুন ঝকমকি
ঠিকরোলে দাঁত মন্দ কি ?"

হরিবাবু বিরাট হাঁফ ছাড়লেন। বোঝা গেল ছড়া শেষ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা আপনি গোঁফ ছাঁটাটা জোড়ার তালিকায় দিলেন কেন এত জিনিস থাকতে ?"

হরিবাবু বললেন, "গোঁফ তো রাখ না, রাখলে বুঝতে। গোঁফে ভুল ছাঁট পড়বেই আর সেই ছাঁটের জন্য তখন যা আফসোস হয়, মনে হয় জুড়ে দিতে পারলে হত।" বোঝা গেল আসর শেষ হয়ে আসছে। পাঁচুর মা ঢুকল কাপ ডিস নিতে। নিমেটা কেমন ঝিমিয়ে ছিল। হরিবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কেন ছড়াটা ঠিক পছন্দ হল না বুঝি ?"

নিমে বলল, "না না ছড়াটা দারুণ হয়েছে। সব পয়েণ্টগুলোই কভার করেছেন। আচ্ছা, আপনারা ঝক্‌মকিতে মেজেছেন ?"

হরিবাবু বললেন, "সে আর বলতে। দু-দুটো টিউব একেবারে সাফ। দারুণ মাজে ভায়া, দারুণ। ওই পাঁচুর মাও মেজেছে। বিশ্বাস না হলে ওকে জিজ্ঞেস করো।"

নিমের মুখে এতক্ষণে আবার হাসি ফিরে এসেছে, সে হরিবাবুকে ধন্যবাদ দিতে থাকল। আমি উঁকি মেরে দেখতে লাগলাম পাঁচুর মা'র দাঁতের দিকে। একটু যেন বড় ঠাহর হচ্ছে। পাঁচুর মা কথাগুলো সব শুনেছিল। তাকে কিছু না জিজ্ঞেস করতেই বলল, "ভীষণ ভালো মাজে গো দাদাবাবুরা, এমন মাজলো যে গিন্নীমা পর্যন্ত একেবারে চুপ। কে বলবে কাঁসার বাসন, যেন সোনার মত জ্বলছে।"

হরিবাবু হঠাৎ ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে কান চুলকোলেন। আমি দেখলাম একটা মশা নাকের ওপর বসে রক্ত খাচ্ছে ওনার খেয়াল নেই। হরিবাবু লজ্জায় হাত কচলালেন, "আর দুটো টিউব দেবেন। সত্যি খুব ভালো মাজন।"

আমরা হরিবাবুর বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। নিমে একটা বড়ো নিশ্বাস ফেলল, "লোকটা ছড়া মন্দ লেখে না, তবে বড় ইয়ে।"

আমি বললাম, "লোকটা বড় ইয়ে হতে পারে কিন্তু কচুরিগুলো বড় ভাল।"

* * *

নিমে যেমন ধূমকেতুর মতন উদয় হয়েছিল তেমনই হাওয়া হয়ে গেল। ঝক্‌মকিকে বা ঝক্‌মকিদের মাঝে মাঝেই দোকানের শো-কেসে দেখেছি। আমার সাহস কম তাই মাজা হয়নি। বিজ্ঞাপনের ছড়াটাও দেখেছি কাগজে টাগজে। কিন্তু নিমেকে আর দেখিনি। ইতিমধ্যে

pathagar.net

আমার রেজাল্ট বেরিয়েছে, বোটানিতে ব্যাক্ পেয়েছি। বছর দেড়েক কেটেছে,এসপ্ল্যানেডে একদিন দৌড়ে বাস ধরতে গিয়ে সপাটে একটা লোকের সঙ্গে গোঁত্তা খেলাম। আমি তাকিয়েছিলাম ন' নম্বরের দিকে, ন' নম্বরটা আমার বাড়ির দিকে তাকিয়ে নাকের ওপর দিয়ে হৈ হৈ ক'রে চলে গেল। লোকটাকে কতগুলো কড়া কথা বলার জন্য মুখ ফিরিয়ে দেখি নিমে দাঁত বার ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। আমি পাশ কাটাবার অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু নিমে নাছোড়, "রাগ কচ্ছিস কেন বেকার, সত্যি ভীষণ ব্যস্ত ছিলাম, দেখা করার সুযোগই পাইনি।"

আমরা একটা রেস্তরাঁয় বসলাম। নিমের কথার থেকে বোঝা গেল তার ঝক্‌মকি বেশ জোর কদমেই চলছে। নিমে বলল, "একটা সমস্যায় পড়েছি, একদল ডেন্টিস্ট আমার পেছনে বড় লেগেছে।"

"তা তুমি ওদের পসার নষ্ট করবে আর ওরা তোমায় ছেড়ে দেবে?"

"ঠিক সে রকম নয় বুঝলি। একটু খুলে বলছি। গত বছর বড়

দিনের দিন আমার বাড়িতে একপাল ডেন্টিস্ট এসে হাজির। সঙ্গে ফুলের মালা, মিষ্টির বাক্স, কেকের বাক্স, কাজু বাদাম আরো কত কি। দু চারজন তো আমাকে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানালে। একটু পরেই ব্যাপারটা খোলসা হল। ডেন্টিস্টদের পসার হঠাৎ সাংঘাতিক বেড়ে

গেছে, তিন বছরের খদ্দের এক বছরে। ওরা খুঁজে খুঁজে ঠিক বার করেছে যে ঝক্‌মকি চালু হবার পর থেকেই এমনটা ঘটছে। তাই ওরা এসেছে ঝক্‌মকির স্রষ্টাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে। সেদিন আমার খুব ভাল লেগেছিল। কিন্তু তখনও বুঝিনি যে ওর পেছনে বিপদ লুকিয়ে আছে।"

আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলাম, "বিপদ কেন? কি ধরনের বিপদ?"

"বিপদ ব'লে বিপদ, তুই ভাবতেই পারবি না। কমাস না যেতেই ডেণ্টিস্টগুলোর টনক নড়ল যে আমি যদি হঠাৎ ঝক্‌মকি বন্ধ ক'রে দিই তাহলে ওদের পসার ফের তিনগুণ থেকে একগুণে নেমে যাবে। ওরা লেগে গেল আমার পেছনে ঝক্‌মকির ফারমুলাটা, সেই যে বাম্বের প্রাফেসারের ফারমুলাটা হাতানোর জন্য আর আমার পেছনে লেলিয়ে দিল ঠগ, জোচ্চর, গুণ্ডা, পুলিস, পকেটমার, দালাল, ম্যাজিসিয়ান, এমন কি ওভারকোট পরা আড়চোখে তাকানো, চুরুট মুখে ডিটেকটিভ। ভারি সমস্যা, ভাবছি ছেড়েই দেব ফারমুলাটা। একটা সুগন্ধী মাথার তেলের ব্যবসা করব। ডেণ্টিস্টগুলো যা টাকা দেবে বলছে তাতে আস্ত একটা তেলের মিল হয়ে যাবে। একবার তেলের মিল হলেই আবার যাবো তোর হরিবাবুর কাছে মিলের জন্য। লোকটা ভারি পয়া।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "নতুন ক'রে মাথার তেলের ব্যবসা··· পারবি?"

নিমে টেবিল চাপড়ে বলল, "আলবৎ।"

একটা খটাং ক'রে শব্দ হল, আমি চমকে উঠলাম। একপাটি বাঁধানো দাঁত ঠিক্‌রে টেবিলের ওপর। ওটা বোধ করি "ৎ" এর জোরটা সামলাতে পারেনি।

হরিবাবুর ছড়াটার শেষ দুটো লাইন আমার মনে পড়ে গেল। আমি নিমেকে বললাম, "সেদিন হরিবাবুর বাড়িতে তুই বেকার চটেছিলি। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই ঝক্‌মকিতে দাঁত মেজেছিলেন যার থেকে ওই লাস্ট দুটো লাইনের উৎপত্তি।"

নিমে বাঁধানো দাঁতের পাটিটা মুখে চালান করে, মনীষীদের মতন মুখ করে, উদাস গলায় বলল, "কিছু পেতে গেলে কিছু দিতে হয়।"

# বলাইবাবুর বিপদ

হস্টেলের মাঠে সবুজ ঘাসের ওপর গদ্দাম করে পড়লেন বলাইবাবু। সাথে সাথেই পড়েছে কানাই। বলাইবাবুর ঘাড়ে। পট করে দেখলে মনে হবে এই ভোরবেলায় কানাই বলাই দুজনে দলাইমলাই করতে লেগেছে। "কোঁক" করে একটা শব্দ করলেন বলাইবাবু, আর কানাই "বাবাগো" বলে একটা পেল্লায় আর্তনাদ ছাড়লো।

"বাবা গো" টা প্রচণ্ড জোরে হল। একটা কুকুর ঘুম থেকে উঠে কেঁউ কেঁউ করতে করতে প্রাণপণ ছুট লাগালো। কতগুলো কাক কা কা করে ডেকে উঠল। একটা চিল এদিকে তাকাতে গিয়ে সোজা

নারকোল গাছের মাথায় গোঁত্তা খেল, একটা ঝুনো নারকোল ছিটকে পড়ল হরির পায়ের কাছে। মাথাটা অল্পের জন্য বেঁচে গেল।

কানাইটা শীর্ষাসন করতে গিয়ে সটান পড়েছে বলাইবাবুর গায়ে। আচমকা ধাক্কায় আমাদের ফিজিক্যাল ইন্‌স্ট্রাকটার বলাইবাবু টাল সামলাতে পারেননি। তাতেই এই কীর্তি।

কানাইটা একনাগাড়ে "বাবাগো বাবাগো" বলে চেঁচিয়ে চলেছে। নিজের ব্যথা ভুলে বলাইবাবু লাগলেন কানাইয়ের পরিচর্যায়।

আমরা কিন্তু জানি কানাইয়ের কিছুই হয়নি। ও শুধু ফন্দি মাফিক চলেছে।

সমীর আমার কানে কানে বললো, কানাইটার কি আর তিনকুলে কোনও আত্মীয় নেই? থাকলে আর্তনাদটা আরও স্বাভাবিক হত।

কানাইকে ধরাধরি করে আমরা হস্টেলের ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলাম। কানাই একভাবে "বাবাগো বাবাগো".....বলে চেঁচিয়ে চলেছে! বলাইবাবুর মুখটা একটু নার্ভাস নার্ভাস লাগছে। কখনও ঘাড় চুলকোচ্ছেন, কখনও বা মাথা। কানাইকে চিৎ করা হল, উপুড় করা হল, বসানো হল, ত্যাড়ছা করা হল, য-ফলার মতন করা হল কিন্তু, "বাবাগো বাবাগো" থামল না।

বলাইবাবু জিজ্ঞেস করলেন—"কোথায় লেগেছে বাবা কানাই, ঘাড়ে?"

"বাবাগো।"

"পিঠে?"

"বাবাগো।"

"পায়ে?"

"বাবাগো।"

pathagar.net

পরিশ্রান্ত হয়ে বলাইবাবু বললেন, "এ তো ভারি মুশকিলে পড়া গেল! কোথায় লেগেছে তা পর্যন্ত বলছে না—খালি বাবাগো আর বাবাগো।"

আমরা অনেকেই অনেক রকম সাজেশন দিলাম, "একটু গরম সেঁক দিলে হয় না? একটু বরফ লাগালে—একটু ডিমের পুলটিশ থেবড়ে দিলে হয়ত বেঁচে যেত স্যার।"

বলাইবাবু বললেন, "আমিও তো অনেক কিছুই ভাবছি কিন্তু কোথায় লাগাবো? বাবাগো ছাড়া কিছু বলেই না।"

হরি একটু আমতা আমতা করে শুধোল, "বাবাগো বলে কোনও মাস্‌ল বা গ্ল্যান্ড শরীরে নেইতো স্যার? আপনি যেমন রোজই আমাদের কতো মাস্‌ল আর গ্ল্যান্ডের নাম শেখান, বাইসেপ, থাইশেপ, ল্যাটিস, থাইরয়েড, বাবাগোও হয়ত সেইরকমই একটা কিছু। কানাইয়ের নিশ্চয় বাবাগোতেই লেগেছে। নামটা জাপানিও তো হতে পারে।"

কানাইটা এতক্ষণ চিৎ হয়ে শুয়েছিল, হরির কথা শেষ হতেই হঠাৎ উপুড় হয়ে গেল আর শরীরটা "বাবাগো"র সাথে মৃদু কাঁপাতে থাকলো। ঘরে দু-চারটে খুক্‌ খুক্‌ শব্দ শোনা গেল। বলাইবাবুর মুখ দেখে বোঝা গেল, বেশ ফাঁপরে পড়েছেন। মনের ডিক্সনারিটা হাতড়ে দেখছেন বাবাগো বলে কোনও মাস্‌লের নাম আছে কিনা।

বলাইবাবু বললেন, "একটু ভেবে দেখি। এই ফাঁকে হরি যাওতো ঠাকুরের কাছ থেকে এক গেলাস গরম দুধ চেয়ে আনো।"

কানাই যতক্ষণ দুধ খেলো ততক্ষণ বাবাধ্বনি দুধে চাপা পড়লো। কিন্তু শেষ হতেই সেই এক চ্যাঁচানি।

নয়ন বললো, "যতক্ষণ দুধ খায় ততক্ষণ বোধহয় বাবাগো পায় না। ওকে বেশ কয়েক গেলাস দুধ খাইয়ে দেখলে হয় না স্যার? দুধগুলো শেষ হতে হতে হয়ত বাবাগোটা ভুলে যাবে। কানাইটা বেজায় ভুলো। আরো দুধ আনবো স্যার?"

"কানাই-এর বাবাকে একবার আনলে হত না স্যার? হয়ত বাবাকে দেখতে চাইছে দেখলেই সেরে যাবে।" হরি একটু ভয়ে ভয়ে বলে।

আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না বলাইবাবু—খিঁচিয়ে উঠলেন। "তোমরা বক্তৃতা থামাবে? যাওতো নয়ন, দৌড়ে গণেশ ডাক্তারকে ডেকে আনো। ওঁর ফিটা না হয় আমিই দিয়ে দেব।"

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, "স্যার হোমিওপ্যাথিতে কি কাজ হবে?" কিন্তু সাহসে কুলোল না।

গণেশ ডাক্তার দশ মিনিটের ভেতর হাজির হলেন হন্তদন্ত হয়ে। এক হাতে টর্চ আর স্টেথো, আরেক হাতে জামার বোতাম লাগাতে লাগাতে। মাঝ বয়েসী ভদ্রলোক, দেখলেই বোঝা যায় বেশ ভাল পসার। নয়নের হাতে ডাক্তারবাবুর ব্যাগ, সাধারণ হোমিওপ্যাথির ব্যাগের চেয়ে কিছু বড়ো।

ডাক্তারবাবু কানাই-এর খাটের পাশে বসেই অজস্র প্রশ্ন শুরু করে

pathagar.net

দিলেন। রাত্রে কোন পাশ ফিরে শোয়? ঘুমনোর সময়, চোখ কি বোজে? নাক ডাকে কি না? বাঁ নাক না ডান নাক? হস্টেলে বেড়াল কটি? শেষ কবে চান করেছে? ইত্যাদি।

কানাই থেকে থেকেই বাবাগো বাবাগো করে চলেছে। প্রশ্নের জবাবগুলো আমরা যতটা পারলাম টকাটক দিয়ে গেলাম। গণেশ ডাক্তার গম্ভীর মুখে একটু পায়চারী করলেন তারপর ব্যাগ থেকে টেনে বার করলেন ইয়া মোটা এক বই, ওপরে লেখা মেটিরিয়া মেডিকা। আমরা একমনে ওঁর কার্যকলাপ দেখতে থাকলাম।

গম্ভীর মুখ করে গণেশ ডাক্তার বললেন—"মাথা খাইছিস। হেপাটাইটিস্, মেনেনজাইটিস্, আর্থারাইটিস কিছুর সাথেই যে মিলছে না রে। খালি খালি calling father তো কোথাও নেই। অবশ্য একজায়গায় রয়েছে calling God."

বলাইবাবু লাফিয়ে উঠলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ ওটাই হবে। ভগবানই তো সকলের আসল পিতা, ওঁকেই ডাকছে নিশ্চই।"

গণেশ ডাক্তার বললেন, "তাহলে ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে। এমন জায়গায় চোট লেগেছে যে ও মনে মনে একটা কাল্পনিক ছবি দেখছে। ওর পিতা বা বিশ্বপিতা দাঁড়িয়ে আছেন ওর সামনে আর ও তাঁকে ডেকে যাচ্ছে। মন থেকে ছবিটা মুছে দিতে হবে ওষুধ দিয়ে।" গণেশ ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লিখলেন—

(১) এনাগিলিস—৩০
(২) হেমামালিশ—২০০
(৩) নাইট্রিক এসিড—১,০০০

নয়নের হাতে প্রেসক্রিপশন ধরিয়ে গণেশ ডাক্তার বললেন, "এখনও দোকান খোলেনি। এক দৌড়ে আমার বাড়ি গিয়ে তোমার বৌদিকে বলো এই ওষুধগুলো দিতে।"

পাঁচ মিনিটের ভেতর নয়ন হাঁপাতে হাঁপাতে ওষুধ নিয়ে ফিরল।

এনাগিলিস যে গিলে খাবার ওষুধ তা নাম থেকেই বোঝা যায়। নয়ন টক্ করে কানাইএর মুখে ক' ফোঁটা ঢেলে দিল। কানাইকে মনে হল একটু চাঙ্গা হচ্ছে। হেমামালিশটা দিতে গিয়ে নয়নের কেমন সন্দেহ হল। "এটা কি মালিশ করবো ডাক্তারবাবু?"

গণেশ ডাক্তার হাঁ হাঁ করে উঠলেন, "কেন মালিশ করবে কেন?"

নয়ন আমতা আমতা করলো "আজ্ঞে নামটা……" বলে কয়েক ফোঁটা ঢেলে দিল কানাইএর গলায়।

গোল বাঁধলো নাইট্রিক এসিড নিয়ে। বলাইবাবু আর আমরা সকলে, রসায়নবিদ না হলেও এটুকু জানি যে নাইট্রিক এসিড দিয়ে যে কোনও ভাষায় বাবাগো চিরকালের মতন স্তব্ধ করে দেওয়া যায়।

কানাই, গণেশ ডাক্তারের বাগানের অর্ধেক পেয়ারা একা খেয়েছে তা হয়ত সত্যি, তাই বলে এভাবে জিঘাংসা চরিতার্থ করতে গণেশ ডাক্তারকে আমরা কখনোই দেব না।

বলাইবাবুই প্রথমে বললেন, "একেবারে নাইট্রিক এসিড, একটু বাড়াবাড়ি হবে না?"

গণেশ ডাক্তার হ্যা হ্যা করে খুব খানিকটা হাসলেন, "ওতে নাইট্রিক এসিড হাজার ভাগের এক ভাগও নেই। তাছাড়া ওটা কানাইএর জন্য নয়। ওটা জলে গুলে বেড়ালগুলোকে খাইয়ে দেবে। তাহলেই ওগুলো আর নিজের বাসা ছেড়ে নড়বে না। বড্ড জ্বালায় ওগুলো। রোজ দুকুরবেলা হানা দিয়ে আমাদের সব মাছ খেয়ে ফেলে।"

নাইট্রিক এসিড বলে কথা। আমাদের আর বলাইবাবুর কারুরই ঠিক বিশ্বাস হল না। হরি বলেই বসল, "অবলা জীব……।"

"বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? এই দেখ আমি খেয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি" বলে গণেশ ডাক্তার মুখের মধ্যে ক ফোঁটা চালান করে দিলেন।

আমরা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিলাম। না গণেশ ডাক্তার পড়ে গেলেন না। দিব্যি চেয়ারে হেলান দিয়ে কান খোঁচাতে থাকলেন।

হোমিওপ্যাথি সত্যিই মন্তরের মত কাজ করে। কানাই উঠে বসেছে। একটু হাঁসফাঁস করছে বটে কিন্তু "বাবাগোটা" অনেক কমে গেছে।

বলাইবাবু গণেশ ডাক্তারের অনেক প্রশংসা করে তাঁর ফিস্ দিতে গেলেন। গণেশ ডাক্তার বললেন, "ওটি পারবো না। এমনিতেই বাগানে আম, জাম, পেয়ারা থাকে না, কানাইএর চিকিৎসায় ফি নিলে গাছগুলোও হস্টেলের বাগানে চলে আসবে। কিন্তু হোমিওপ্যাথি কিরকম কাজ করে দেখলেন? মন্তরের মতন।"

কানাই মোটামুটি সুস্থ, বাবাধ্বনি নেই। হঠাৎ গণেশ ডাক্তার বললেন, "নয়ন আমায় একটু বাসায় পেঁাছে দেবে? অন্য জায়গায় থাকতে কেমন ভয় করছে। নাইট্রিক এসিডটা না খেলেই হত। এটা ওরই এফেক্ট।"

* * *

বলাইবাবু আমাদের হস্টেল সুপার হয়ে আসার পরদিন থেকেই জীবন হয়ে উঠেছিল দুর্বিসহ। হেডস্যারের মাথায় মাঝে মাঝেই উদ্ভট খেয়াল চাপে এটা তারই একটা। ছেলেদের মানসিক ট্রেনিং-এর সাথে শারীরিক ট্রেনিংও ভালোভাবে দিতে হবে। মাধ্যম, ব্যায়াম আর যোগ ব্যায়াম। বলাইবাবুকে হেডস্যারই কোন এক ইস্কুল থেকে প্রায় ছিনিয়ে এনে ইস্কুলের ফিজিক্যাল ট্রেনিং-এর ভার দিয়ে করে দিয়েছেন হস্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। আগের ইস্কুল নাকি তাঁকে ছাড়তে চায়নি। হেডস্যার ভাঙিয়ে এনেছেন অনেক লোভ দেখিয়ে।

বলাইবাবুর চেহারাটা দেখার মতন। একহারা বেতের মতন। দেখে বয়স বোঝার যো নেই। বহুবার যোগ কম্পিটিশনে প্রাইজ পেয়েছেন। মুখটা একটু হরতুকী পানা আর গায়ের রংটা সন্ধ্যের পর মশাদের ফাঁকি দেবার মতন হলে কি হয়, সর্বাঙ্গে পৌরুষ আর লাবণ্য উপচে পড়ছে।

সেই থেকেই আমরা নাজেহাল। বলাইবাবু রোজ ভোর পাঁচটায় হস্টেলের সকলকে ঘুম থেকে তুলে দেন। কোনও রকমে মুখে দু-একটা বিস্কুট গুঁজে হাজির হতে হয় হস্টেলের মাঠে, ঠিক সাড়ে পাঁচটায়। তারপর নাগাড়ে দেড় ঘণ্টা ধরে চলে বজ্রাসন, শীর্ষাসন, কূর্মাসন, সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যাসন, ডন বৈঠক আরো অনেক ধরনের যোগব্যায়াম। আমরা সকালে দেড় ঘণ্টা যোগব্যায়াম করে যখন ইস্কুলে যাই তখন সকলে ঢুলছি। শুভঙ্কর বাবুর ক্লাসে, অঙ্কের যোগব্যায়াম যায় গুলিয়ে। যারা হস্টেলে থাকে না তাদের আমরা হিংসে করি। ওরা আটটার সময় উঠে, ক্লাসে আসে যেন, ফাগুন মাসের কচি সজনে ডাঁটা আর আমরা ক্লাসে যাই যেন সাতদিনের বাসি হিঙ্গেশাক।

* * *

একদিন আমরা, ক্লাস টেনের ছেলেরা, সন্ধ্যেবেলায় গল্প করছি, এমন সময় হস্টেলের জুনিয়র যতো ছেলে, এসে ভীড় করে দাঁড়ালো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম "কি ব্যাপার ?"

"তোমরা কি কিছু ব্যবস্থা করবে ? না কি আমাদের চিরকাল এই ভোর পাঁচটায় উঠতে হবে ?" বললো ওরা।

আমরা একটু লজ্জিত হয়ে পড়ি। সত্যিই তো, হস্টেলের স্বাস্থ্য রক্ষার কর্তব্য তো সিনিয়রদেরই। আমি বলি "তোমরা যাও, আমরা দেখবো যাতে সব ঠিক হয়ে যায়।"

নয়ন বললো—"এই সুপার মানে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কিন্তু বড়ো

সাংঘাতিক। আমরা তো সব রকম চেষ্টাই করে দেখেছি। উঠোনে কাটা বাল্ব ভাঙা, জানলা দিয়ে গোবর ছোঁড়া, তারস্বরে রেডিও বাজানো, একশো টাকা চাঁদা নেওয়া সবই হাসিমুখে সহ্য করেছে।

আমরা পড়লাম মহা সমস্যায়। অবশেষে ভেবে ভেবে এই প্ল্যানই স্থির হয়েছে। হয় সুপার থাকবে, নয় আমরা।

* * *

বলাইবাবুর কথামত কানাই মাছের ঝোল ভাত খেয়ে সারাদিন হস্টেলে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল, কিন্তু কানাই-এর অসুখের কথাটা দাবানলের মতন ইস্কুলে ছড়িয়ে পড়ল। হেডস্যারের সাথে আরও দুজন স্যার হস্টেলে গিয়ে কানাই-এর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে এলেন।

টিফিনের পর সেদিন ক্লাস বসতে না বসতেই ক্লাস টেনের চারটে সেকশনের হস্টেলের ছেলেদের মধ্যে অদ্ভুত সব বিকার দেখা দিতে লাগলো। আমাদের সেকশনে হরি আর নয়ন অঙ্কের স্যার শুভঙ্কর বাবুকে গিয়ে বললো, "বড্ড পা ব্যথা করছে, একটু বৈঠক দেব স্যার ?"

শুভঙ্করবাবু কেমন হকচকিয়ে গেলেন। "পা ব্যথা করছে তো বৈঠক দেবে কেন ?"

"আজ্ঞে বলাইবাবু বলছেন কোন একসাইজের জন্য যদি ব্যথা হয় তাহলে তক্ষুণি সেই একসাইজটাই আবার করবে। দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।" শুভঙ্কর বাবুর উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে হরি আর নয়ন বৈঠক শুরু করে দিল। একটা করে বৈঠক দেয় আর ব্যথা কমলো কি না বোঝবার চেষ্টা করে।

আমার কেমন ঘুম ঘুম পাচ্ছিল। শুভঙ্কর বাবুকে বললাম, "একটু শবাসন করছি স্যার," বলেই মেঝের ওপর সটান চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লাম। শুভঙ্করবাবুর অঙ্কের ক্লাস মাথায় উঠল। সব ফেলে উনি পড়ি কি মড়ি করে ছুটলেন হেডস্যারকে ডাকতে।

হেডস্যারের আসতে বেশ কিছুক্ষণ দেরি হল। তাঁর কাছে আগেই খবর পৌঁছেছিল। টেনের অন্য সেকশনগুলোতেও তিন-চারজন করে ডন, বৈঠক, ভুজঙ্গাসন, সর্বাঙ্গাসন ইত্যাদি করে চলেছে। সি সেকশনের মাধবের একসাইজ করতে গিয়ে চোয়াল আটকে গেছে, মোটেই কথা বলতে পারছে না।

বাকি সেকশনগুলো সেরে হেডস্যার যখন আমাদের এ সেকশনে ঢুকলেন, মুখটা থম্‌থম্‌ করছে। সঙ্গে বলাইবাবু, দু-চারজন অন্য স্যার

আর যারা অন্য ক্লাসে ব্যায়াম করছিল তারা। বলাইবাবুকে বেশ নার্ভাস লাগছে। মুখটা ফ্যাকাশে পানা। ক্ষোভে আর লজ্জায় তো বটেই, কিছুটা দুঃখেও হয়তো।

হেডস্যার হিমশীতল গলায় বললেন—"ব্যায়ামবীরেরা আমার সঙ্গে টীচার্স রুমে এস।" আমরা গুটিগুটি হেডস্যারের কথামত চললাম। দৃশ্যটা দেখবার মতন। স্যারেরা আগে আগে আমরা জনা বারো পিছে পিছে। কেউ পায়ের ব্যথায় ল্যাংচাচ্ছে, কেউ ঘাড়ের ব্যথায় মুখটা এমন করে রেখেছে দেখলে মনে হবে ভ্যাংচাচ্ছে। মাধব চলেছে হাঁ করে—ওর যে চোয়াল আটকানো।

ক্লাস টাস ফেলে অর্ধেক স্যার চলে এসেছেন টিচার্সরুমে। হেডস্যার একটা চেয়ার টেনে গুছিয়ে বসলেন। অন্য স্যারেরা বিরাট টেবিলটার চারধারে ইতস্ততঃ বসে আছেন। বলাইবাবু হেডস্যারের ঠিক পাশেই। সংস্কৃত স্যার, বাচস্পতি মশাই, ঝিমোনোর ব্যাঘাত ঘটাতে বিরক্ত মুখে আমাদের দিকে মিটি-মিটি তাকাচ্ছেন। হেডস্যার আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন "আজ সকাল থেকে এসব কী ঘটে চলেছে? তোমরা কেউ বুঝিয়ে বলতে পারো?"

নয়ন ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে এগিয়ে গেল, "আমি বলব স্যার?"

"বলো"

"রোজ ভোর পাঁচটায় উঠে সাড়ে পাঁচটার থেকে দেড় ঘণ্টা ব্যায়াম করে গায়ে, হাতে, পায়ে ব্যথা আর খিল ধরে যায়। কাল বলাইবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম "কী করা যায় স্যার?" বলাইবাবু বললেন, যেখানে ব্যথা করবে সেই জায়গাটার ব্যায়াম যদি তক্ষুণি করতে পারো তাহলেই সেরে যাবে। ধরো পায়ে ব্যথা করল, গোটা কয়েক বৈঠক দেবে পটাপট।"

হেডস্যার তাকালেন বলাইবাবুর দিকে। বলাইবাবু চোয়াল শক্ত করে রয়েছেন—কিছু বললেন না।

"তাই বলে ক্লাসের ভেতর এই সমস্ত করবে?"

"কি করবো স্যার পায়ের ব্যথাটা বেড়েই যাচ্ছিল। শেষে যদি আর না সারে? যদি পঙ্গু হয়ে যাই? পড়াশুনায় ভালো নয় বলে আপনিই তো বলেছেন আমাকে মুটেগিরি করতে হবে। কিন্তু পা গেলে তো তাও জুটবে না। ওই দেখুন না স্যার মাধবের চোয়াল আটকে গেছে। ওর চোয়াল কি আর জীবনে ঠিক হবে? কানাইটা তো স্যার বাঁচলে হয়। এ সবই ওই কম্ম ঘুমিয়ে, পাঁচটায় উঠে ব্যায়াম করার ফল স্যার।" প্রায় কেঁদেই ফেলল নয়ন।

হেডস্যার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—"কঠিন সমস্যা।"

আমাদের সর্বকনিষ্ঠ স্যার কেমিস্ট্রির ফটিকবাবু মনে করেন সব সমস্যারই একটা কেমিক্যাল সমাধান হয়। ফটিকবাবু বললেন, "একটু লিকুইড প্যারাফিন খাইয়ে দেখলে হয় স্যার। পালোয়ানরা সবাই খায়। লিকুইড প্যারাফিন মনে হয় দেহের কলকব্জাগুলোতে তেলের কাজ করে।"

"তোমার ছেলেমানুষী থামাবে ফটিক?" খিঁচিয়ে উঠলেন হেডস্যার। স্যারেরা অনেকেই এই সমস্যার ভেতরও হাসি চাপতে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। ছেলেরা প্রচুর খুক্ খাক্ আওয়াজ করল। মাধব কিন্তু অনড়। ভিসুভিয়াসের মত হাঁ করেই দাঁড়িয়ে আছে।

হেডস্যার অন্য স্যারেদের কথা পারতপক্ষে শোনেন না। এক বাচস্পতি মশাইয়ের ছাড়া। বয়সের আর সংস্কৃত বাক্যবানের জোয়ার উপেক্ষা করা যায় না বলেই হয়তো। বাচস্পতিমশাই হরিকে জিজ্ঞেস করলেন "হস্টেলে তো অন্য ক্লাশের ছেলেরাও থাকে—তা খালি তোমাদের ক্লাশে এরকম হচ্ছে কেন?"

হরি একটু থতমত খেলেও চট করে বলে দিল, "ওরা স্যার বয়সে ছোট, ওদের খাটার ক্ষমতা ঢের বেশী।"

বাচস্পতি মশাই জিজ্ঞেস করলেন—"তুমি নয়নের সঙ্গে একমত?"

শুধু হরিই নয় আমরা অনেকেই হৈ হৈ করে জানিয়ে দিলাম যে আমরা সবাই এক মত। ওই ভোর পাঁচটায় উঠে ব্যায়াম করেই কাল হয়েছে।

বাচস্পতি স্যার বললেন—"আমার মনে হয় এরা ঠিকই বলেছে··· সাড়ে পাঁচটায় যোগ ব্যায়াম করলে এমনটা হতেই পারে···"

যাক্ বাবা ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। আমি আনন্দে দিবাস্বপ্ন দেখে ফেল্লাম। একটা বিশাল উঁচু খাটে শুয়ে আছি, বলাইবাবু হাত পাচ্ছেন না। ঘড়িতে বাজে সওয়া সাতটা। নয়নটা আরেকটু হলেই ল্যাংচানো ছেড়ে নেচে ফেলেছিল আর কি।

একটু দম নিয়ে বাচস্পতি মশাই বলে চললেন। "যৌগিক ব্যায়াম হল অধ্যাত্মিক জিনিস। বেলা সাড়ে পাঁচটায় করলে তো গায়ে ব্যথা হবেই। বলাই, তুমি কাল থেকে ওদের চারটেয় অর্থাৎ মাহেন্দ্রক্ষণে তুলে দিও তাহলেই দেখবে আর গায়ে ব্যথা হবে না। আমরা ছেলেবেলায় ওই সময়েই করতাম।"

মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। শুধু আমাদের মাথাতেই নয়

ভিসুভিয়াসের মুখেও। অজান্তে কখন মাধবের মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। নয়নের ল্যাংচানো গেছে থেমে।

হেডস্যার একটু ভেবে বলাইবাবুকে বললেন—"তাহলে কাল থেকে তাই করবে। ভোর চারটে। উনি অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও'র কথাটাই শোনা উচিত।"

বলাইবাবুর গম্ভীর মুখ গম্ভীরই রইল। হাঁ বা না কিছু বললেন না। দেখে মনে হল লজ্জা কমলেও রাগ আর দুঃখ কমেনি। যাদের এতো করে শেখাই, তারাই শেষে···।

আমরা হস্টেলে ফিরলাম একপাল পরাজিত সৈনিকের মতন। ক্লান্ত অবসন্ন বিধ্বস্ত। অন্যদিন বিকেল-বেলা হস্টেলে আনন্দের ফোয়ারা ছোটে—খেলাধুলো, হাসি ফাজলামীতে মেতে থাকে হস্টেল। সুপার

বলাইবাবুও প্রায়ই আমাদের সঙ্গে যোগ দেন। আজ আমাদের মেজাজ নেই। যে যার ঘরে চলে গেলাম, বিকেলের টিফিন সেরে। বলাইবাবু ফিরেছেন আমাদেরও আগে। ঘর থেকে বেরোন নি।

সন্ধে ছটা নাগাদ হরি আমাদের ঘরে এলো সঙ্গে একপাল জুনিয়র ছেলে। ছেলেগুলো আমাদের দোষারোপ করতে থাকলো। "তোমরা এটা কি করলে বলত ?" ক্লাস ফাইভের ঝুলন বলল, "রাত চারটেয় উঠতে হলে আমরা স্রেফ মারা পড়ব।" জুনিয়রদের নালিশের সামনে আমাদের মুখ লুকোনোর সত্যিই জায়গা নেই। এমন নাকাল আমরা এর আগে কখনও হইনি।

নয়ন বলল "একটা প্ল্যান আসছে মাথায়।"

হরি প্ল্যানটা শোনার জন্য উদগ্রীব হল।

আমি বললাম "নয়ন, ভাল কথা শোন। ওসব প্ল্যান, ফ্ল্যান, ছাড়। বলাইবাবু সাধাসিধে ভাল লোক। চল, সকলে গিয়ে বলি স্যার যা হবার তা হয়ে গেছে, আমরা আগের মতন রোজ সাড়ে পাঁচটাতেই ব্যায়াম করব।"

কথাটা নয়নের মনঃপুত না হলেও আমি দেখলাম বেশীর ভাগ ছেলেরই সম্মতি আছে। আমার স্বপক্ষে যুক্তি টানার জন্য আমি বলে চললাম—"দেখ বলাইবাবু আমাদের কোনও ক্ষতি করেননি। বরং উপকারই করেছেন। মাধবটা তো তাজা কঙ্কালের মতন ছিল। এখন দেখ কেমন চেহারা ফিরেছে—জ্যোতি, বিকাশ, হরি এগুলোর তো কিছু হজমই হত না। এখন পারলে থালা বাটি পর্যন্ত গিলে খায়। সর্দি জ্বর, নাকে ফুসকুড়ি, কানে হাজা, পেটে ব্যথা, গেঁটে-বাত বলাই-বাবু ওই যোগব্যায়ামের ধাক্কায় সারিয়েছেন, কি না ?"

এই অকাট্য যুক্তি কেউই কাটাতে পারল না।

"এর জন্য ওঁর কিছু গুরু দক্ষিণাও তো প্রাপ্য। আমাদের ব্যায়ামে তো আপত্তি নেই আপত্তি শুধু ওই ভোর পাঁচটা। ওনাকে বুঝিয়ে বললে ভোর পাঁচটাটা হয়ত ছটাও হয়ে যেতে পারে।"

হরি বলল—"হ্যাঁ দোষটা তো আমাদেরই। আমরাই তো ওনাকে মিছিমিছি তাড়ানোর চেষ্টা করছিলাম। দরকার হলে ক্ষমা চেয়ে নেব—বলব "এমন আর হবে না স্যার। যোগী লোক—টপ করে ক্ষমা করে দেবেন।"

* * *

আমরা সদলবলে রওনা হয়ে গেলাম বলাইবাবুর ঘরের দিকে, রাত তখন আটটা। দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি বলাইবাবুর ঘরের আলো

জ্বলছে। বলাইবাবু এই সময় একটু বইপত্তর নাড়াচাড়া করেন—হস্টেলের হিসেব পত্তর মেলান।

আমরা দলটার সামনে। ঠিক করে নিয়েছি কি বলব। একটা বিহিত করতেই হবে মুখ বাঁচানোর জন্যে। হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লাম বলাইবাবুর ঘরে।

ওমা !! বলাইবাবুর ঘর ফাঁকা। আমরা আনাচে কানাচে খুঁজতে যাচ্ছিলাম কিন্তু, হরি বলল—"বেকার খুঁজে লাভ নেই বলাইবাবু চলে গেছেন।" আমরা তাকিয়ে দেখলাম হরি ঠিকই বলেছে। তক্তপোষের নীচে ট্র্যাঙ্ক নেই। এমনকি দেওয়ালে ঝোলানো ঠাকুরের ছবিটাও নিয়ে যেতে ভোলেননি বলাইবাবু।

আমরা ছুটে গিয়ে হস্টেলের দারোয়ান ছট্টুলালকে জিজ্ঞেস করলাম। ছট্টুলাল খুব সাধারণভাবে জবাব দিল "বলাইবাবু তো সেই সাতটায় চলে গেছেন। আমাকে একটা চিঠি দিয়েছেন হেডস্যারকে দেবার জন্য।" আমাদের একটা ভাঁজ করা কাগজ দেখালো সে।

বলাইবাবুর অভাবটা এই প্রথম আমরা অনুভব করলাম। হঠাৎ একরাশ অনুতাপ আমাদের পেয়ে বসল। ছিঃ ছিঃ, আমরা অত ভালো লোকটাকে তাড়িয়ে ছাড়লাম! যে লোকটা আমাদের বিন্দুমাত্র অপকার তো করেই নি বরং প্রচুর উপকার করেছে—শিষ্যদের কাছ থেকে এতবড় অপমানটা ওঁর সহ্য হয়নি। না হবারই কথা।

কেউ বাধা দেবার আগেই হেডস্যারকে লেখা চিঠিটা নয়ন এক ঝটকায় টেনে নিয়ে খুলে ফেলল,

শ্রদ্ধেয় মৃণালবাবু,

আপনার বিশেষ অনুরোধেই আমি শক্তিপুরের ইস্কুল ছেড়ে এসে এখানে যোগ ব্যায়াম শেখাতে রাজী হই। আমি বহু যোগ ব্যায়াম কম্পিটিশনে প্রাইজ পেয়েছি সে কথা ঠিক, কিন্তু জীবনে কখনও সাড়ে সাতটার আগে বিছানা ছাড়িনি। রোজ পাঁচটায় উঠতে আমার ভীষণই কষ্ট হত।

আজ বাচস্পতি মশাই যে বিধান দিয়েছেন, তা পালন করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি শক্তিপুরে ফিরে যাচ্ছি। আমার নীরব প্রস্থান মার্জনা করবেন। ছেলেদের আমার স্নেহাশীষ দেবেন, আপনি আমার প্রণাম নেবেন,

বিনীত,
বলাই দাস

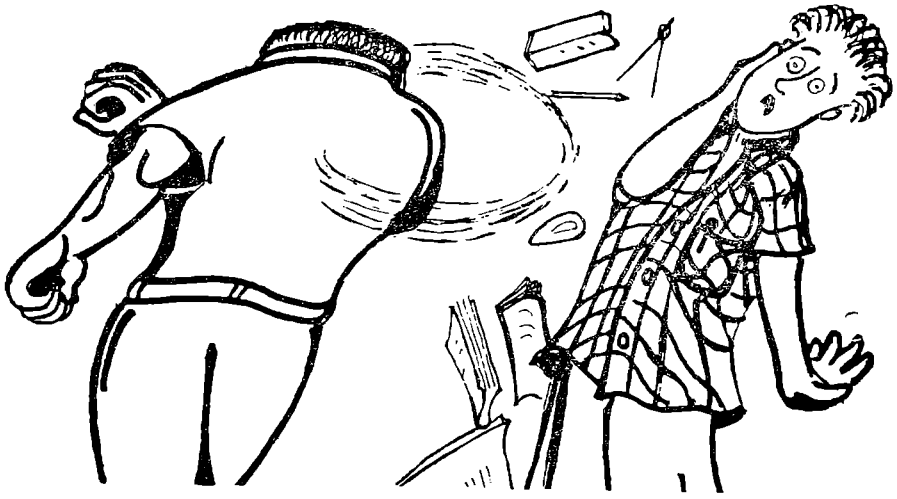

# মনি ব্যাগটা দেখি

ক্লাস সেভেনে এই স্কুলটাতে যখন ভর্তি হলাম তখন আগের স্কুলের বন্ধুদের জন্য ভীষণ মন কেমন করতো। আগের স্কুলটা ছাড়ার আদপেই কোনো ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু বাবার বদলীর চাকরী। বছরের মাঝামাঝি, শুধু এইটাতেই ঠাঁই পাওয়া গেল। বাড়ি থেকে বেশ দূরে। থাকতে হবে হস্টেলে। আমি মৃদু আপত্তি করেছিলাম, "হস্টেলে থাকতে হলে আগের ইস্কুলের হস্টেলে থাকলেই তো হত।"

বাবা মোটেই আমল দেননি। "এখানে অন্তত শনি রবিবার বাড়িতে আসতে পারবে। তাছাড়া এ স্কুলটা ওটার চেয়ে ঢের ভালো রেজাল্ট করে।"

স্কুলটার দূরত্ব খাস কলকাতা থেকে মাইল দশেক। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে বাড়ি পেঁছিনো যায়। পড়াশোনার চাপটা একটু বেশী ঠিকই কিন্তু খেলাধুলোর সুযোগও প্রচুর।

pathagar.net

লাগোয়া একটা বিরাট মাঠ। ফুটবল, ক্রিকেট, কপাটি যা প্রাণ চায়, যতক্ষণ প্রাণ চায় খেল।

মাঠের প্রান্তে, স্কুলের মেন গেটের পাশেই একটা ছোটো জিমনেশিয়াম। সেখানে অনেকেই ছুটির পর শরীর তাজা রাখার জন্য কসরৎ করে। ডন বৈঠক, ডাম্বেল, বারবেল, বক্সিং ছাড়াও চলে আরও কতো ধরনের শরীর গড়ার চেষ্টা।

তখনও বন্ধু বান্ধব তেমন হয়নি, স্কুল সেরে একাই হস্টেলে ফিরছিলাম হঠাৎ দেখি একটা লোক আমার পিছু নিয়েছে। এক ধরনের লোক আছে যাদের বয়স কিছুতেই ঠাহর হয় না। পঁয়ত্রিশ হতে পারে আবার পঞ্চান্ন হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। শির বের করা চেহারা, প্রকৃতি সব রস নিংড়ে যেন একটা ধাঁধা তৈরী করেছে। পঁয়ত্রিশ না পঞ্চান্ন? স্কুল থেকে হস্টেলে ফেরার পথ একটা আমবাগানের ভেতর দিয়ে। বেশ বড়ো আমবাগান। যখন আমবাগানটার প্রায় মাঝামাঝি পৌঁছেছি তখন হঠাৎ লোকটা পেছন থেকে আমার কলার খামচে ধরে বলল, "মনি ব্যাগটা দেখি!"

আমি ভীষণ ঘাবড়ে গেলাম। চারপাশে পঞ্চাশ গজের ভেতর কেউ নেই যে সাহায্য করতে পারে। আমি ভয়ে ময়ে পকেট হাতড়ে পাঁচটা টাকা ভর্তি মনি ব্যাগটা বার করে তাড়াতাড়ি লোকটার হাতে দিতে গেলাম।

লোকটা কিন্তু ব্যাগের দিকে ফিরেও তাকালো না। হা হা করে হাসিতে ফেটে পড়লো, "ভয় পেয়ে ঘাবড়ে গেলি, ব্যাগটা দিয়ে দিচ্ছিলি? এই কলজে নিয়ে পুরুষ মানুষ হবি।"

আমি মনে মনে ভাবলাম পাগলের পাল্লায় পড়েছি, চোর, ডাকাত, ভূতএমন কি পুলিশও এর চেয়ে ঢের ভালো ছিল। হয়ত এখনই হাতে ক্যাঁক করে কামড়ে দেবে। লোকটা কিন্তু সেরকম কিছুই করলো না, হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো, "তোর কি করা উচিত ছিল বলতো?"

আমি এমনই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম যে কিছুতেই ঠাহর করতে পারলাম না কি করা উচিত ছিল, চুপ করেই রইলাম।

"বলতে পারলি না তো? আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

আমি বোঝবার জন্য উদগ্রীব হতে যাচ্ছিলাম কিন্তু সময় পেলাম না। একটা বেশ ভালো ওজনের ঘুসি এসে পড়লো আমার ডান গালে, মাথাটা ঝনঝনিয়ে উঠলো।

"একটা আপার কাট ঝাড়বি বুঝলি। এই রকম সুড়সুড়ির মতন নয়, একেবারে চোস্ত আপার কাট। এর অন্তত একশো গুণ ভারি। যাতে বাছাধন তিনটে নড়া দাঁত নিয়ে তিনদিন হাসপাতালে শুয়ে ভুল বকে। একটা আপার কাটে যদি শায়েস্তা না হয় তাহলে ? তাহলে একটা জব্বর হুক করবি।"

এবার আমি সাবধান ছিলাম। লাফিয়ে পিছিয়ে গেলাম। আমার কোঁকের একটু পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল হুকটা। লাগলে নির্ঘাৎ "কুঁক্" করে আওয়াজ করতাম। হয়তো সেই জন্যেই মারটার নাম হুক। লোকটার কিন্তু সাংঘাতিক ব্যালেন্স। হুকটা ফস্কাতে এক চক্কর ঘুরে খাড়া হয়ে গিয়ে বললো, "কাল থেকে জিমনেসিয়ামে আসবি, বক্সিং শিখবি আমার কাছে।"

আমি হস্টেলে ফিরে বেশ জমিয়ে রোমাঞ্চকর গল্পটা বলার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু কেউই তেমন আমল দিল না। সকলে বললো, "ওঃ জহরদার গল্প আর নতুন করে কি শুনবো। নতুন ছেলে এলেই তো সেই এক গল্প, তোকে কোথায় ধরেছিল ?"

আমি বললাম, "আমবাগানে।"

হস্টেলের ছেলেদের কাছে শুনে যা বুঝলাম তা এই। সকলেই প্রথমে এসে একবার না একবার জহরদার খপ্পরে পড়েছিল। ছেলেদের নামগুলো তখনও ঠিক মুখস্ত হয়নি, একজন বললো "আমাকে জহরদা ধরেছিলো মিঞার দোকানে। তখন নতুন এসেছি কাউকেই প্রায় চিনি না। ইস্কুলের গেটের পাশে মিঞার দোকানে একলা এককোণে বসে ফ্রেঞ্চ টোস্টে কামড় দিতে যাবো, হঠাৎ জহরদা পাশে এসে বলল, "মনি ব্যাগটা দেখি ?" আমি একটু ভয় পেলুম। অন্য উপায় না দেখে মনি ব্যাগটা জহরদার হাতে দিলাম। জহরদা হ্যা হ্যা করে হেসে উঠলো। "ব্যাগটা ঢুকিয়ে রাখ।" তখনও জহরদার সাথে পরিচয়ই হয়নি। জহরদা বললো "ধর তুই একটা ফাঁকা রেস্তোরাঁয় বসে একা একটা চপ খাচ্ছিস।" চপ খাওয়াটার ভঙ্গীটা কথার সঙ্গে দেখিয়ে দিল জহরদা। হঠাৎ একটা লোক এসে ঠিক এই ভাবে তোর মনি ব্যাগটা চাইলো। কি করবি বলতো ?"

আমি ভাবছিলাম কি করবো, কিন্তু ভাবার সময় না দিয়েই জহরদা বলল, "মুখে ভাব দেখাবি যেন খুব ঘাবড়ে গেছিস কিন্তু মনে মনে ঘাবড়াবি না। এই যে প্লেটটা দেখছিস্," হঠাৎ জহরদার গতি তিনগুণ

হয়ে গেল, "এই প্লেটটা টেবিলে আছড়ে ভেঙে নিয়ে লোকটার মুখে ঘষে দিবি।" বলার সাথে সাথে ঘষে দেবার ভঙ্গীটাও দেখিয়ে দিল জহরদা। "খুব তাড়াতাড়ি করবি যাতে লোকটা কোনও সুযোগই না পায়।"

বেশ কয়েকজনের কাছে শুনে বোঝা গেল জহরদার গল্প একটাই— শুধু স্থান কাল পাত্রই বিভিন্ন। ধর তুই একলা একটা ফাঁকা রাস্তা দিয়ে ফিরছিস একটা লোক এসে তোর মানি ব্যাগ চাইলো অথবা ধর তুই ফাঁকা ট্রেনে যাচ্ছিস একটা লোক···অথবা ধর তুই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে ফিরছিস্ একজন বললে টাকাগুলো দেখি অথবা···। তখন যা করতে হবে সেগুলো মোটামুটি এক ছকে বাঁধা। প্রথমে ঘাবড়ানোর ভান। তার পরেই বিদ্যুৎ গতিতে কারো মুখে ঘষতে হবে রাস্তা থেকে তোলা খোয়া, কারো চোখে ছুঁড়তে হবে বালি আর বাকিদের লাগাতে হবে আপার কাট, লোয়ার কাট বা হুক।

নিজের কথা কমই বলতেন জহরদা। কিন্তু হাজার হলেও মানুষের মন। ঢেউ উঠবেই। দুর্বল মুহূর্তে জহরদার কিছু কিছু কথা বেরিয়ে পড়তো।

জহরদার মা বাবা ছেলেবেলাতেই বিদায় নিয়েছিলেন। জহরদা মানুষ পূর্ববঙ্গে এক কাকার কাছে। স্কুল ফাইনালের পর আর পড়াশোনার সুযোগ মেলেনি। স্কুল থেকেই বক্সিং-এর প্রতি সাংঘাতিক টান ছিল জহরদার। একটানা চার বছর ইণ্টার স্কুল বক্সিং প্রতিযোগিতায় মিড্‌ল-ওয়েট চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। শুনলে অবাক লাগে রানার্স আপ ছিল পাশের স্কুলের গগনদা। জহরদার ভীষণ বন্ধু আর বক্সিং-এর সতীর্থ।

জহরদারা বক্সিং যাঁর কাছে শিখেছিলেন তিনি ছিলেন ভারি অদ্ভুত লোক। জীবনে কোনো টুর্নামেণ্ট লড়েননি, প্রাইজ পাননি। কিন্তু জহরদার মতে ইণ্টার ন্যাশানাল যে কোনও টুর্নামেণ্টে গোটা চারেক প্রাইজ পাওয়া ওঁর কাছে নাকি কোনো ব্যাপার না। উনি বলতেন, "বক্সিং আসলে আত্মরক্ষার জন্য। মজার জন্য। সাহস বাড়ানোর জন্য। লোক দেখানোর জন্য নয়। যা শিখিয়ে দিলাম এই শিক্ষা যদি সব ছেলেদের ভেতর বিলিয়ে দিতে পারিস তাহলে ভারতবর্ষের চেহারাটাই পাল্টে যাবে। কটা আপার কাটে যদি সাহস বাড়িয়ে দাসত্বের মনোভাব কাটিয়ে দিতে পারিস তো খুশি হবো। বুঝবো গুরু দক্ষিণা পেলাম।"

সেটা পরাধীনতার যুগ। জহরদা আর গগনদা দুজনেই চাকরী পেয়েছিলেন স্কুল জিমনেশিয়ামের কোচ হিসেবে পূর্ববঙ্গে। গুরুদক্ষিণা মেটানোর চেষ্টা করতেন প্রাণপণ, ছেলেদের বক্সিং শিখিয়ে আর সাহস যুগিয়ে।

জহরদা বিয়ে করেছিলেন। গগনদা করেননি। হঠাৎ জীবন-ধারায় অনেক ফারাক হয়েছিল দুজনের। মাত্র ক'বছর। জীপ এক্সিডেণ্টে যেদিন চোখের ওপর দিয়ে বৌ আর ছেলে চলে গেল জহরদাকে ফেলে, জহরদা সেদিনই প্রথম মর্মে মর্মে বুঝলেন জহর দাস, বক্সিং-এর কোচ। পৃথিবীতে এইটুকুই পরিচয়। গগনদা অনেক ভাগ্যবান, ওঁকে সংসারের মায়া কখনও ছুঁতে পারেনি।

"ছেলেটা বেঁচে থাকলে হয়তো তোদের মতনই হতো" চোখের কোণটা চিকচিক করে উঠতো জহরদার। মন অবিন্যস্ত হওয়াটা মানে লাগতো জহরদার। তাড়াতাড়ি চলে যেতেন অন্য কথায়। "পিকনিকের দিনটা ঠিক হয়েছে রে দিলু?"

পার্টিশনের সময় সব কেমন ওলোট পালোট হয়ে গেল। শেয়ালদা স্টেশনে যখন নামলেন জহরদা গগনদাকে সাথে নিয়ে, তখন বড্ড অসহায় লাগছিল। মাথার ওপর ছাত আর পেটের রুটির সমস্যা যে ডাইনোসরের রূপ নিয়ে সামনে দাঁড়াবে, ভাবেননি কখনও। জহরদা বসে রইলেন প্ল্যাটফর্মে আর গগনদা গেলেন মাথার ওপর একটা ছাতের খোঁজে।

সারারাত যখন ঠায় কেটে গেল, তখন জহরদা বুঝলেন গগন পথ গুলিয়েছে গগন আর ফিরবে না। জহরদা একা। আপনার বলতে একটাই লোক ছিল, গগনদা, সেও গায়ের। কলকাতার এই বিশাল জনসমুদ্রে জহরদা একা।

জহরদা অনেক খুঁজেছেন গগনকে, গগনদাও নিশ্চয়ই খুঁজেছেন কিন্তু গত পনের বছরে কোনো হদিশ মেলেনি। জহরদার পার্সোনাল ব্যাপারে নাক গলানোর অধিকার আমাদের ছিল না। তাও পাকে প্রকারে জিজ্ঞেস করেছিলাম বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন কিনা।

জহরদা বলেছিলেন, "বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম কিন্তু গগনের ছবি ছিল না তাই ফল যা হল, এক এক পাগলের খপ্পরে পড়লাম, সে আরেক কাহিনী। কেউ গগনের হদিশ দিতে পারলে তাকে একশোটা করকরে টাকা দেবই এখনও দেব।"

জহরদা স্কুলের কাছে একটা ছোট ভাড়া বাড়িতে একাই থাকতেন। রান্নাবান্না করার জন্য একটা ঠিকে লোক ছিল। সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে গেলে হয়তো মানুষকে কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে হয়। জহরদা আঁকড়ে ছিলেন স্কুলের জিমনেশিয়ামটা আর ছেলেদের। ধ্যান, জ্ঞান সাধনা সবই ওর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

হস্টেলে কারো শরীর খারাপ হলে জহরদা প্রায়ই এসে খোঁজখবর করতেন। আমরা জহরদাকে অসুস্থ ছেলেদের পাশে বসে যে কতো রাত ঠায় জাগতে দেখেছি তা গোনা যায় না। কিছু জিজ্ঞেস করলে বলতেন, "কষ্ট কেন হবে ? তোরা আমার ছেলের মতন, তোদের মাঝেই তো হারানো ছেলেটাকে কাছে পাই।"

সব ছেলেদের সাথেই জহরদার ভালো সম্পর্ক থাকলেও আমরা দশ-বারোজন কেন জানি না জহরদার সব থেকে কাছের মানুষ হয়ে পড়েছিলাম।

নয়ন আর হরির ওপর অগাধ আস্থা ছিল জহরদার। বলতেন "স্কুল ছেড়ে যাবার আগে আমাকে একটা গুরুদক্ষিণা দিবি না ? বেশী না একটা। মাত্র একটা। ন্যাশনাল লেভেলেও না স্টেট লেভেলের একটা প্রাইজ।"

আমাদের ক্লাশ টেন হয়ে গেল। কিন্তু আফসোস থেকে গেল যে জহরদাকে কোনোদিন কারো সাথে সত্যিই মারপিট করতে দেখলাম না। পথে ঘাটে কথা কাটাকাটি প্রায়ই হত। কিন্তু মাথা ভারি ঠাণ্ডা জহরদার, বেশী দূর গড়াতো না। অনেকেই বলতো "ছাড় ! ওসব বক্সিং টক্সিং রিঙের ভেতরেই চলে। গুণ্ডাদের সাথে তোদের জহরদাকে পেঁয়াজী করতে হবে না।"

"পেঁয়াজী" কথাটা শুনে গা রি রি করতো। "মুখ সামলে"-র চেয়ে বলার বেশী কিছুই নেই। কারণ জহরদা কাউকেই কখনও মারেন নি। নয়ন, জহরদার খাস চেলাদের একজন, বলতো "চেলার হাতটাই দেখবি একটু চেখে ?"

"রাখ, রাখ। বছর বছর তো কম্পিটিশনে যাচ্ছে ছেলেরা, একটাও তো ভদ্রলোকের মতন প্রাইজ পেতে দেখলাম না।"

আরেক চেলা হরি বলতো, "দেখবি, দেখবি আজ হোক, কাল হোক পাবেই পাবে।"

অন্যদের কথা শুনে শুনে আমরাও যেন জহরদার ব্যাপারে কেমন

সন্দিহান হয়ে পড়ছিলাম। জহরদার সেই এক কাজ। ছেলেদের বক্সিং শেখানো, আর নতুন ছেলে এলেই "দেখি মনি ব্যাগটা ?"

নয়ন বললো, "এই বছরেই তো পাশ করে স্কুল ছেড়ে চলে যাবো··· আমি বাধা দিলাম, "মনে হয় না।"

নয়ন একবার আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলল, "জহরদাকে গুরু দক্ষিণা দেবার একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবো।"

হরি বলল, "আমারও তাই মত।"

আমার চেষ্টার অভাব কিংবা কিছুর একটা অভাব। আমি বক্সিংটা ঠিক ওদের মতন রপ্ত করে উঠতে পারিনি তাই চুপ করে রইলাম।

পাক্কা সাত মাস হরি আর নয়ন খেটেছিল বটে। আর সাথে খেটেছিল জহরদা। খাটনি যে ঠিক কেমন বা কতটা হতে পারে তা ওদের না দেখলে বোঝা যায় না। ক্লাসের সময়টা বাদ দিয়ে বাকি প্রায় পুরো সময়টাই চলতো ওদের বক্সিং-এর রেওয়াজ আর দম বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন কসরৎ। দেখলে কে বলবে জহরদার সাতান্ন বছর বয়স।

স্টেট লেভেল প্রতিযোগিতা যেদিন শুরু হল, তার আগের দিন জহরদা কালীঘাটে পুজো দিয়ে এসেছিলেন। স্কুল থেকে মাত্র দুজন প্রতিযোগী। দুজনেই মিডলওয়েট। নয়ন আর হরি। প্রতিযোগীরা সকালবেলায় কালীঘাটের প্রসাদ খেয়ে, আমাদের অজস্র শুভ কামনা সাথে নিয়ে রওনা হয়ে গেল।

প্রথমে দু চারটে ধাপ হরি আর নয়ন খুব সহজেই জিতল। ওদের বা জহরদার কারুরই কোনো উচ্ছ্বাস দেখা গেল না। ওটা সকলেই জেতে।

হরি আউট হয়ে গেল সেমিফাইনালে। সেদিন হরির কান্নাকাটির চোটে হস্টেলের অর্ধেক ছেলের মাথা ধরে গেল। দুঃখটা স্বাভাবিক। হরিটা যা খেটেছিল !

নয়ন ফাইনালে উঠলো। আমাদের স্কুলে যা কখনও কেউ জীবনে ভাবেনি। জহরদা ক্রমাগত নয়নকে বুঝিয়ে চললেন চ্যাম্পিয়ন হওয়া চাই। একেবারে সেরা। রানার্স আপ মানেও কিন্তু হেরে যাওয়া।

ফাইনালটা দেখতে আমরা, জহরদার চেলারা দশজন গেছলাম। প্রতিযোগিতা শুরু হল। জহরদা দর্শকের মাঝ থেকে চেঁচাতে শুরু করলেন। "মার, মেরে ঝাঁঝরা করে দে।"

ও পক্ষের সাপোর্টাররাও চেঁচাচ্ছে।

আমরাও হল্লা শুরু করলাম, "মেরে ফাটিয়ে দে নয়ন" ইত্যাদি।

যে ছেলেটা লড়ছিল নয়নের সাথে, তার শরীর খারাপ কিনা কে জানে—সেকেণ্ড রাউণ্ডের শেষে আর উঠতেই পারলো না। ছেলেটাকে দেখে কষ্ট হচ্ছিল। মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে।

আমরা আনন্দে ফেটে পড়লাম, "নয়ন ইন্টার স্কুল চ্যাম্পিয়ন।"

জহুরদাকে এতো উত্তেজিত আমরা আগে কখনও দেখিনি। নয়নকে বুকের ভেতর জাপ্‌টে ধরে বললেন, "সাবাস, দারুণ দিয়েছিস।"

নয়নও কম উত্তেজিত নয়, তখনও হাঁফাচ্ছে। "ছেলেটা সেমি-ফাইনাল অবধি এগোলো কি করে? দু রাউণ্ডের বেশী লড়তেই শেখেনি।"

আমরা সকলে নয়নকে ঘিরে নাচতে থাকলাম।

প্রাইজ দেওয়া হবে অন্যদিন। এবার হস্টেলে ফেরার পালা। একটা বাসে এসে শ্যামবাজারে নামলাম সকলে। জহরদা বললেন, "চল কিছু খাওয়া যাক।"

সামনের যে মিষ্টির দোকানটা পেলাম তাতে ঢুকে পড়লাম। জহরদা বললেন, "যা খুশি খা।"

সকলেরই খিদে বেশ জোর পেয়েছিল। ঝটপট দোকানের ওজন বেশ খানিকটা কমে গেল।

যে বাসটা স্কুলের খুব কাছ দিয়ে যায় সেটা পাওয়া গেল না। তখন সাড়ে আটটা বেজে গেছে। জহরদার কথামতো আর দেরী না করে আমরা অন্য একটা বাসে চড়ে বসলাম যেটা স্কুলের প্রায় দেড় মাইল দূরে নামিয়ে দেয়।

বেলডাঙার মোড়ে যখন নামলাম তখন সাড়ে নটা বেজে গেছে। চাঁদনী রাত, চারদিক স্নিগ্ধ আলোয় ঝলমল করছে। দু ধারে ধান ক্ষেত আর ইতস্তত ছড়ানো গাছ, মাঝে সোজা পিচের রাস্তাটাকে মনে হচ্ছে আমাদের জন্য একটা রুপোলি সাটিনের কার্পেট পাতা। আমাদের সামনে প্রায় একশো গজ দূরে এক ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা স্কুলের দিকেই চলেছেন। এতো দূর থেকেও ভদ্রমহিলার শাড়িতে চাঁদের আলোর ঝিলিক দেখতে পাচ্ছি আমরা।

রাস্তা বরাবর যতোদূর চোখ যায় আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে আমরা কজন বাদে সারা পৃথিবীটাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

হৈ হল্লা করতে করতে আমরা এগোচ্ছি। সামনে চলেছেন জহরদা, দুই খাস চেলা, নয়ন আর হরির কাঁধে হাত রেখে। জহরদা বললেন, "সামনে যারা চলেছে হয় তাদের খুব সাহস আছে নয়তো ওরা জানে না জায়গাটা তেমন সুবিধের নয়। প্রায়ই খুন জখম হয়।"

জহরদার কথা তখনও শেষ হয়নি। আমরা দেখলাম চারটে লোক যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল। পথ আগলে দাঁড়ালো ওদের। স্পষ্ট দেখলাম একজনকার ছুরি থেকে এক ঝলক চাঁদের আলো ঝিকিয়ে উঠতে।

জহরদা বললেন, "ব্যাপারটা সুবিধের নয়, দৌড় লাগা।"

যেই বলা সেই কাজ। আমরা প্রাণপণ ছুট লাগালাম সামনের ভীড়টা লক্ষ্য করে। ছুটতে ছুটতে আমরা দেখতে পেলাম ভদ্রলোক

ঘড়ি খুলছেন, মানিব্যাগ বার করতে যাচ্ছেন। দুটো লোকের হাতে ঝকঝকে ছুরি, বাকি দুজনের খালি হাত।

গুণ্ডাগুলো যে আমাদের খেয়াল করেনি তা নয়। কিন্তু ওদের অভিজ্ঞতায় ওরা জানতো এতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। রাস্তার লোকেরা সাধারণতঃ ছুটে আসে না, গা বাঁচায়; কদাচিৎ দৌড়ে এলে ওই দৌড়নো অবধিই। ছুরি দেখলেই সব সট্‌কে পড়ে পটাপট।

সেদিনই প্রথম উপলব্ধি করলাম, জহরদার সাথে ঘুরে ঘুরে ভয়টা কতো কমে গেছে আমাদের। দশটা ছেলের একটাও পিছিয়ে পড়েনি ভয়ে। ছজনকে ঘিরে আমরা এগারোজন। জহরদার কথাগুলো মনে পড়ে গেলো "ধর তোর মনিব্যাগটা কেউ চাইলো…"

গুণ্ডাগুলো তখনও আমাদের পাত্তাই দিচ্ছে না। লোকগুলোর মজবুত চেহারা। একটার গায়ে লুঙ্গী আর গেঞ্জি, অন্যগুলোর পাজামা পাঞ্জাবী।

জহরদার দুপাশে নয়ন আর হরি। জহরদার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। এটা জহরদার মুখ? চোখ দুটো আংরার মতন জ্বলছে, চোয়ালের হাড় ফুটে বেরোচ্ছে, নাকের পাটা কাঁপছে। সব মিলিয়ে মুখটা বীভৎস।

যে গুণ্ডাটা ছুরি দুলিয়ে ভদ্রমহিলাকে কানের দুল খুলে দিতে বলছিল তাকে জহরদা কর্কশ গলায় বললেন, "কি হচ্ছে কি?"

"সেটা কি তোকে বলতে হবে নাকি?" ছুরিটা ঘুরলো জহরদার দিকে। মাত্র হাত তিনেক দূরত্ব।

এক লহমায় জহরদা যেন ফেটে পড়লেন। হরি আর নয়নের দু কাঁধে ভর দিয়ে জহরদা শরীরটাকে একটা ঝাঁকুনি দিলেন। অব্যর্থ লক্ষ্য। জোড়া বুটের লাথিটা সোজা লোকটার মুখে। "মার হরি, মার নয়ন, মার পুলক, মেরে ফাটিয়ে দে। বেটা ছুরি দেখাচ্ছে আমাদের।"

পরের পাঁচটা মিনিট যে কিভাবে কাটলো তা লেখা সম্ভব নয়। কোথায় ছুরি কোথায় কি। লাথি, ঘুঁষি, চড়, কিল, ইঁট, পাথর, বেল্টের একটা বৃষ্টি হয়ে গেল। গুণ্ডাগুলো পালানোর চেষ্টা করেছিল। লাভ হয়নি। দেখছিলাম ডাকাতগুলো একবার নয়ন, একবার জহরদা, একবার পুলক, একবার আমি, সকলের কাছেই ছিটকে বেড়াচ্ছে। পাঁচ মিনিটও কাটেনি, সব কটাই শুয়ে পড়লো।

যে ডাকাতটা জহরদাকে ছুরি দেখিয়েছিল সেটাকে জহরদা চুলের মুঠি ধরে দাঁড় করালো, "আর ছুরি দেখাবি ?"

জহরদা যে কি জিনিষ সেদিনই আমরা ঠিক ঠিক বুঝলাম। সব কটা ডাকাতকে একে একে ক্ষমা চাইয়ে ভদ্রলোকদের জিনিষ ফিরিয়ে দিয়ে জহরদা বললো, "আপনারা জানেন না জায়গাটা খারাপ ?"

ভদ্রলোক আমতা আমতা করলেন, "সবে দুদিন এসেছি, আজ এক বন্ধুর বাড়ি থেকে ফিরছিলাম।"

ভদ্রমহিলা এতক্ষণ স্ট্যাচুর মতন দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলেন। আমরা অনেক ধন্যবাদ পেলাম আর পেলাম পরের বুধবার ভদ্রলোকের বাড়িতে খাওয়ার নেমন্তন্ন।

উন্মত্ত অবস্থায় যখন হস্টেলে ফিরলাম তখন সাড়ে দশটা বেজে গেছে। দেখি আমার মামাতো ভাই অজয় বসে আছে আমার অপেক্ষায় অন্য ছেলেদের সাথে। অজয় সিংভূমে একটা স্কুলে নাইনে পড়ে। থাকে হস্টেলে। আমি উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করলাম, "বাড়ির খবর সব ভালো তো রে ?"

অজয় বললো, "হ্যাঁ হ্যাঁ সব ভালো। পিসিমাকে বাবার কতগুলো জিনিস দিতে এসেছিলাম। ভাবলাম তোমার গেস্ট হয়ে হস্টেলে কয়েকটা দিন থেকে যাই। অসুবিধে নেই তো ?"

আমি বললাম, "না, না অসুবিধে কিসের ?"

একে নয়ন চ্যাম্পিয়ন তায় রাস্তায় ওই ঘটনা। হস্টেলে সেদিন রাতে প্রায় সকলেই জেগে রইলো। চলল শুধু গুলতানি।

পরের দিন স্কুলেও খবরটা ছড়াতে, নামমাত্র পড়াশোনা হল।

সন্ধেবেলা মিঞা দোকান থেকে আমি আর অজয় গল্প করতে করতে ফিরছি আমবাগানের মাঝ-খান দিয়ে, হঠাৎ দেখি জহরদা। অজয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, "দেখি মানিব্যাগটা।"

আমি মজাটা দেখার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, হঠাৎ অজয় ঘুরেই দমাক্ করে একটা ঘুষি ঝাড়লো জহরদাকে। জহরদা আচমকা ঘুষির টাল কোনোরকমে সামলালেন। এরকম ঘটনা কখনই ঘটেনি আগে। যা ভেবেছিলাম তাই। জহরদাকে বোঝানোর আগেই প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন অজয়ের ওপর। আমি ভয়ে চোখ সরিয়ে নিলাম, ভাবতে লাগলাম ছোটমামাকে কি কৈফিয়ৎ দেব। কিন্তু ও কি! জহরদা অজয়কে জড়িয়ে ধরেছেন, গালে হাত বোলাতে বোলাতে, বললেন, "তুমি গগনের ছাত্র ?"

"তাতে তোমার কি ?"

জহরদা আনন্দে আত্মহারা, "গগন কোথায় এখন ?"

"সিংভূমে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "জহরদা, তুমি কি করে বুঝলে ?"

জহরদা আনন্দে হা হা করে হেসে বললেন, "এই প্যাটারসন মার্কা আপারকাট আর কে শেখাবে ?"

টাকার লোভ বড় লোভ তায় একশো। অজয়ের আর সেদিন থাকা হল না। রাতের ট্রেনে রওনা হয়ে গেল সিংভূম। সঙ্গে জহরদা।

pathagar.net

# ধার

রবিবার সকালে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বিশাল ঝামেলায় পড়লেন রামলাল। একমুখ দাড়ি। তিন দিনের দাড়ি। শুক্রবার ছিল ঈদ্, শনিবারও ছুটি। ছুটির দিন দাড়ি কামানোর কথা ভাবলেই গায়ে জ্বর আসে। আজও ছুটি। দাড়ি কি না কামালেই নয়? চট্ করে সারাদিনের প্রোগ্রামটা ভেবে নেন রামলাল। সকাল এগারোটায় আসবে বনোয়ারী—ওকে নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই। বনোয়ারীর কাজ রুপেয়া নিয়ে, রুপে তার মাথাব্যথা নেই। অন্তত রামলালের রুপ নিয়ে তো নয়ই। বিকেল চারটে নাগাদ শিবশংকরবাবু আসবেন মেয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন করতে। ওনার নিজেরই বিশাল দাড়ি তাই খুশিই হবেন হয়তো দলে লোক বাড়ছে ভেবে। তারপর সন্ধ্যেবেলা? আঁতকে ওঠেন রামলাল। ওরে বাবা, মেজ শালী! এমন ফাজিল কমই দেখা যায়। বাড়ি ঢুকেই হয়তো বলবে—"রামলালদাকে একদম কদম ফুলের মতন দেখাচ্ছে।" তারপরেই রামকদম বা কদমরাম নামকরণ হয়ে যাবে রামলালের। রামলালের চেয়ে রামকদম বা কদমরাম নাম হিসেবে হয়তো

pathagar.net

বিশেষ খারাপ না, কিন্তু তার সঙ্গে মেজ শালীর ফাজলামী আর চিড়-বিড়োনো হাসি চলবে জোর কদমে। সারা সন্ধ্যে দম নেবার ফুরসৎ পাবেন না রামলাল। আয়নায় আর একবার ভাল করে দেখলেন নিজেকে। দাড়িরা দাঁড়িয়ে আছে বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে মিছিলের মতন, রামলালের কমাণ্ডের অপেক্ষায়। একমুখ দাড়ি থাকলে কিন্তু বেশ দারিদ্র্য ফুটে ওটে—দাড়িদ্র্যও বলা যায়। খোঁচা খোঁচা দাড়িওলা ভিখিরী দেখলেই মনে হয়—আহা, বেচারার বড় কষ্ট, একে দুটো পয়সা দিই। এমনটা কি পরিষ্কার দাড়ি কামানো থাকলে হয়? কিন্তু রামলালের দারিদ্র্য ফোটানোর প্রয়োজন নেই। মনস্থির করে ফেললেন, কামাতেই হবে।

কামাবার আসবাবেরা একে একে আসরে নামলো। বুরুশ, সাবান, জলের বাটি আর ক্ষুর। ক্ষুরটা বার করে রামলাল একটা গর্বের হাসি হাসলেন। এমন ক্ষুর ক'জনার আছে? খাস বিলাতি জিনিস। রামলালের ঠাকুর্দা এক সাহেবের নেকনজরে পড়ে তার কাছে নেট্ নজর অনেক আদায় করেন—যার অন্যতম এই বিদেশী ক্ষুর। তারপর থেকেই বংশ পর্যায়ে এই ক্ষুর সকলের গালভরা হয়েছে। ভরা গাল থেকে শুকনো গাল, অন্নপ্রাশন থেকে শ্রাদ্ধের ঘাট-কামাই কোনো ঘাটেই কামাই ছিল না। অর্থাৎ কোনো কামাইতেই ঘাটতি ছিল না। এমনকি একবার রামলালের বাবা একটা চোর ধরেছিলেন (সে আর এক গল্প) তার মাথায় ঘোল ঢালার আগে ওই ক্ষুরেই কামিয়ে-ছিলেন। চোর বাবাজী প্রথমে বেগড়বাঁই করেছিলেন, কিন্তু সাহেবী ক্ষুর দেখে একেবারে মুখ চুন করে বসে পড়লেন। এতোদিনে ক্ষুরের এতো গল্প জমেছে যে সাতদিন ধরে বলা যায়।

দাড়ি একবার বড়ো হয়ে গেলে জুলফির শেষ, ঠাহর করা বড়ো মুশকিল। কোথায় যে দাড়ির আরম্ভ আর জুলফির শেষ, একেবারে গুলিয়ে যায়। এই গোলক ধাঁধায় পড়েই অনেক লোকের জুলফি কান ছাড়িয়ে নেমে এসে গালে হামাগুড়ি দেয়। লোকে দেখে ভাবে এটাই বোধহয় হাল ফ্যাসান তাই তারা খুব খাতির করে, আসলে ভুলই লোকেদের জুলফিকার করে তোলে।

আমাদের এক বন্ধুর একটু বেশি বয়সে পৈতে হয়েছিল। মাথা তো ন্যাড়া হলো। কদিন বাদে দাড়ি কামাতে গিয়ে সে পড়লো ভীষণ ফাঁপরে। শেষ পর্যন্ত জুলফির শেষ আর দাড়ির আরম্ভ ঠিক করে যখন কামানো শেষ হলো, বাড়ির লোকে দেখলো পৈতে কানে জড়ালে

জুলফিতে ঠেকছে না। ছেলেটির বাবা প্রচণ্ড বকলেন—"ব্রাহ্মণের ছেলের পৈতে কানে জড়ালে যদি কেশ স্পর্শ না করে তবে সে ব্রাহ্মণই নয়।"

ভাগ্যিস আবার জুলফি গজালো তাই ছেলেটি একটুর জন্যে ত্যাজ্য-পুত্র হওয়া থেকে বেঁচে গেল। আরেক বন্ধুর তার ক'মাস পরেই পৈতে হলো—সে এসব দেখে শুনে এমন কামালো যে জুলফি প্রায় মুখে ঢুকে যায়। তাই দেখে তার ছোটোকাকা তেড়ে উঠলেন—"এই বয়সেই এতো ডেঁপো হয়েছিস্? আমার বয়েসে তো তোর জুলফি মাটিতে লুটোবে রে।" ছেলেটি ক্ষীণ প্রতিবাদ করতে চেয়েছিল, ছোটোকাকা ভীষণ চটে বললেন—"জ্যাঠামি করতে হবে না, পড়তে বস্‌গে যা।"

রামলাল সারা মুখে সাবান মাখিয়ে তাকমাফিক্ ক্ষুর চালাতে যাবেন হঠাৎ একটা চিৎকারে ক্ষুর টানা হলো না। ছোটো ভাই শ্যামলাল বসবার ঘরে বসে পড়ছিল—তারই চিৎকার—"দাদা, ও দাদা।"

রামলাল বিরক্ত হলেন—"বল্ না, কি বলছিস্?"

—"একটা লোক আমাদের ক্ষুরটা ধার চাইছে।"

রামলাল নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না—"কি ধার চাইছে বললি?"

শ্যামলাল উত্তর দিল—"ক্ষুর।"

রামলাল তাহলে ঠিকই শুনেছেন। একটা বাইরের লোক এসে ক্ষুর ধার চাইছে। রামলাল বললেন, "ক্ষুর ধার চাইছে কিরে? ধার চাইবার আর জিনিস পেল না? লোকটাকে এখানে পাঠিয়ে দে।"

শ্যামলাল বোধহয় লোকটিকে একা পাঠাতে ভরসা পেল না। সঙ্গে করে নিয়ে এলো। এই যে, এই লোকটাই ক্ষুর ধার চাইছে, জানালো সে।

রামলাল মনে মনে অপমানিত বোধ করলেন। ধার দেবার কি তার জিনিসের অভাব যে ক্ষুর ধার চাইছে। সত্যি কথা বলতে কি, টুথব্রাশ আর ক্ষুর ছাড়া সব জিনিসই কোনো না কোনো সময় ধার দিয়েছেন রামলাল। ধার দেওয়ার কুফল সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান টনটনে। ঘড়ি, দড়ি, চটি, বঁটি, বই, মই, হারমোনিয়াম, একোয়ারিয়াম সব ধার দেওয়ার অভিজ্ঞতাই তিক্ত। আনন্দ শুধু পেয়েছিলেন একটা ছাতা ধার দিয়ে। এক ভদ্রলোক রামলালের বাড়িতে বৃষ্টিতে আটকে পড়েছিলেন। অনেকক্ষণ উসখুস করে বললেন, একটা ছাতা দেবেন? রামলাল একটা ছাতা দিলেন। ভদ্রলোক দুদিন বাদে ছাতা ফেরত দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলেন।

শ্যামলাল বলল, "তুমি এই নতুন ছাতাটা দিলে, দেখো ঠিক ফেরত দেবে না।"

রামলাল বললেন, "ও সেরকম লোকই না। শুধু ফেরতই দেবে না, দেখবি একেবারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দেবে, একফোঁটা জল বা কাদার দাগ থাকবে না।"

ভদ্রলোক সত্যিই সেরকম লোক না। সপ্তাহ দুয়েক পরে এক সন্ধ্যে-বেলা এসে হাজির হলেন ছাতা নিয়ে।

শ্যামলাল চুপিচুপি বললো, "দাদা, ছাতার রংটা কিরকম ফিকে ফিকে দেখাচ্ছে, ওটা দিয়ে ঘর মুছেছে নাকি?"

রামলাল ফিসফিস করে বললেন, "মনে হয় কাচিয়ে দিয়েছে।"

রামলাল ভদ্রলোককে বললেন, "এমনি দিলেই পারতেন। কি দরকার ছিলো কাচাবার?"

ভদ্রলোক ফোঁস করে উঠলেন, "জানেন আপনার ছাতার জন্যে আমার একশো পঁয়ষট্টি টাকা গচ্চা গেছে। আপনার ছাতার রং উঠে আমার প্যাণ্ট শার্টের বারোটা তো বেজেছেই, বাসে আমার পাশে যে ভদ্রলোক ছিল সে আমার কাছে একটা টেরিলিনের প্যাণ্টের কাপড় আদায় করেছে। আর আপনি সব জেনে শুনে ঠাট্টা করছেন? "বলেই ভদ্র-লোক গটগট করে বেরিয়ে গেলেন।"

শ্যামলাল বললো, "দাদা, আমরা খুব বেঁচে গেছি যা হোক।"

রামলাল বললেন, "দেখলি তো ধার দেওয়ার উপকারিতা।"

লোকটির পরনে লুঙ্গি, গায়ে হাফ শার্ট, সারা গালে খোঁচা খোঁচা

দাড়ি। অন্তত পনেরো দিন কামানো হয়নি। দেখলেই বোঝা যায় একটা ক্ষুর ধার চাওয়াটা তার নিতান্ত প্রয়োজন।

রামলাল প্রথমেই প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি করে জানলে যে আমার ক্ষুর আছে?"

লোকটি বিনীত কণ্ঠে জবাব দিলো, "আজ্ঞে পাড়ার সকলে বললে আপনার সব ভালো ভালো বিদেশী ক্ষুর আছে, তাই ভাবলাম, যদি একটু ধার দেন?"

রামলাল শঙ্কিত হলেন। শ্যামলালকে কাছে ডেকে নিচু স্বরে বলেন, "পাড়ার লোক না ছাই। নিশ্চয়ই কোনোও সিঁধেল চোর ওর বন্ধু আছে, যার কাছ থেকে ও সমস্ত খবর বাগিয়েছে। ক্ষুর ধার করার নাম করে সব শুলুক সন্ধান জেনে যাবে। কি সব্বনেশে কাণ্ড বুঝেছিস!"

শ্যামলালও শঙ্কিত হয়, "ঠিক বলেছ দাদা। সামনের বাড়ির চন্ডীবাবুর গাড়ি আছে, বাড়ি আছে, এ খবর আমরা রাখি। কিন্তু চণ্ডীবাবু আদৌ দাড়ি কামান কিনা সে খবরই আমরা রাখি না, ক্ষুরে কামান না সেপ্‌টিতে কামান, সে তো অনেক দূরের কথা।"

রামলাল বললেন, "আর সত্যিই যদি কামানোর দরকার থাকে তাহলে সেপ্‌টি ধার করলেই পারে। কাঁচা হাতে বেশ সাপটে কাটা যায় বলেই না ওর নাম সেপ্‌টি। কথাটা বোধহয় সাপটানোর চলতি ভাষা।"

শ্যামলাল লোকটির হয়ে সাফাই গায়, "বোধহয় বেশি ধার করতে চায়নি বলেই সেপ্‌টি বাদ দিয়েছে। সেপ্‌টির নিজেরই তিন অঙ্গ, বেলেড নিয়ে চার। চারটিকে ধার করতে হলে একটু চারধার দেখে শুনে করাই ভালো, কারণ সুদ যদি গুনতে হয় তো ক্ষুরের চারগুণ দিতে হবে। তাছাড়া ভালো ক্ষুর একবার ধার করলে ষাটবার কামানো নস্যি। কিন্তু একটা বেলেডের কাম চারবার কামালেই ফতে।"

রামলাল সহজে বুঝবার পাত্র নন, বললেন, "দাঁড়া একটু বাজিয়ে দেখি লোকটা আরো কতো খবর জুটিয়েছে কে জানে।"

খুব মিষ্টি করে রামলাল বললেন, "তুমি কোন ক্ষুরটা চাও?"

লোকটি খুব স্বাভাবিক গলায় বললো, "আপনার হাতের ক্ষুরটা।"

আর মেজাজ সামলাতে পারলেন না রামলাল, ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, "হাতের ক্ষুর মানে? তোমার কি ধারণা আমার পায়েও ক্ষুর আছে?" পাজামাটা ওপরে টেনে কিঞ্চিত পদন্মোচন করলেন রামলাল, লোকটির সন্দেহ মোচনের জন্যে।

লোকটি সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে, "কি যে বলেন স্যার, সেরকম সন্দেহই আমি করিনি। সত্যি বলছি স্যার। আমার কি স্যার এটুকু বুদ্ধি নেই।"

স্যার শুনে আশ্বস্ত হন রামলাল। অল্প খুশিও না হয়ে পারেন না। যাক লোকটা তাহলে একেবারে গো-মূর্খ নয়। মহৎ লোকেদের মতন রামলালও মূর্খ একেবারেই দেখতে পারেন না। লোকটা তাহলে

এ খবরও পেয়েছে যে পৈত্রিক ব্যবসা দেখাশোনা করার আগে রামলাল ইস্কুলে পড়াতেন। তখনই তো সকলে তাকে স্যার স্যার করতো।

লোকটি আবার বললো, "কি যে বলেন স্যার আমার এটুকু বুদ্ধি নেই?"

রামলাল বললেন, "না না, তোমার বুদ্ধি যথেষ্টই আছে একেবারে ক্ষুরধার বুদ্ধি। বইয়ে পড়োনি সমস্ত নামজাদা লোকেদের ক্ষুরধার বুদ্ধি হয়। তাঁরা সব লম্বা লম্বা দাড়ি রেখে লোকের কাছে এই ক্ষুরধার বুদ্ধি প্রয়োগ করেন। নামকরা একজন লোক একমুখ দাড়ি নিয়ে ক্ষুর ধার চাইলে তো সাধারণ লোকে না বলতে পারে না, দিয়ে দেয়। সেই সব ক্ষুর যে কোথায় যায় তা তাঁরাই জানেন, কারণ তাদের দাড়ি বাড়তেই থাকে আর তাঁরা নিশ্চয়ই ক্ষুরের পর ক্ষুর ধার করেন। যাকগে বড়লোকদের খারাপটা বাদ দিয়ে ভালোটাই শিখতে হয়।"

লোকটি বললো, "আমার তাড়া আছে স্যার।"

মনে মনে চটেন রামলাল, "এঃ, ক্ষুর ধার করতে এসে তাড়া দেখাচ্ছেন। না এলেই পারতিস।"

মনটা রামলালের কিন্তু নরমই হয়ে গেছে। মহৎ লোকের কথা ভাবতে ভাবতে পাড়ি জমান তিনি মহৎ লোকে। মহৎ লোকে কতো দানই না করে। আচ্ছা, রামলালের জায়গায় হরিশ্চন্দ্র হলে কি করতেন? নিশ্চয়ই ক্ষুরের সঙ্গে কামানোর বাকি সরঞ্জাম, মায় তোয়ালেটাও দিয়ে দিতেন। দাতা কর্ণ হলে, এসব তো দিতেনই, বাড়ি বয়ে কামিয়ে দিয়ে আসতেন। আর রামলাল এই সামান্য ক্ষুরটা ধার দিতে পারছেন না? একেবারে দিয়ে দেওয়া নয়, ধার দেওয়া, মাত্র ক'দিন ক'মাস বা ক'বছরের জন্য। তাছাড়া রামলালের যখন আরও চারটে ভালো ক্ষুর আছে। ধিক্কারে ভরে উঠলো রামলালের মন। সত্যিই কি ছোট মন তাঁর। একটা লোক বিপাকে পড়ে একটা ক্ষুর ধার চাইছে আর তিনি তাকে চোর গাঁটকাটা কি যা-তা ভাবছেন। রামলাল মনস্থির করলেন, লোকটাকে তিনি ক্ষুরটা ধার দেবেন।

কিন্তু লোকের উন্নতির কথাও তো ভাবা উচিত। ওকে বারবার ক্ষুর ধার দিলে ওর অভ্যেস খারাপ হয়ে যাবে। নিজের ক্ষুর কেনার কথাই ভাববে না। এই একবারই। পরে ধার চাইলে আর পাবে না। এই কথাটা স্পষ্ট বুঝিয়ে দেবেন রামলাল।

রামলাল বললেন, "ক্ষুর ধার করে আর কদ্দিন চলবে?"

লোকটি নম্র ভাবে বললো, "যদ্দিন চলে আর কি। তা আপনার আশীর্বাদে ভালোই তো চলে যাচ্ছে স্যার।"

রামলাল খুব দৃঢ় কণ্ঠে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন, "দেখ, তোমার বিশেষ প্রয়োজন বলেই তোমাকে এই ক্ষুরটা ধার দিচ্ছি। পাঁচদিনে ফেরত দেবে।"

লোকটি বললো, "পাঁচদিনে কি হবে স্যার?"

রামলাল বললেন, "আচ্ছা পুরো এক মাস।"

লোকটি বলল, পাঁচদিন, একমাস, কি হবে স্যার? আপনি ক্ষুরটা দিন, আমি ধড়াধড় করে দু মিনিটেই ধার দিয়ে দিচ্ছি। এমন শান দেব যে ছ মাস কামানো যাবে।"

রামলাল রক্তচক্ষু করে শ্যামলালের দিকে তাকালেন, তবে তুই যে বললি লোকটা ক্ষুর ধার চায়।

শ্যামলাল বললো, "কি হে তুমি বলোনি? ক্ষুরটা ধার দেবেন?"

লোকটি বললো, "আজ্ঞা হাঁ স্যার।"

"কেটলী হয়েছে না গুষ্টির পিণ্ডি হয়েছে"—ভজনের ড্রয়িং খাতা দেখে হুংকার ছাড়লেন বিলাসবাবু। "দেখে এঁকেছ, না, না দেখে?"

ভজন একটু থতমত খেয়ে গেল। "না দেখে স্যার। বিশ্বাস করুন স্যার, গুষ্টির পিণ্ডি আমি জীবনে দেখিনি।"

"আঃ। আমি কেটলীর কথা বলছি!" মুখ বেঁকালেন বিলাসবাবু।

সেই ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস এইট, আমরা বিলাসবাবুর কাছে আঁকা শিখছি। আমরা একটা কেটলী আঁকলে সেটা রসগোল্লা, রাজহাঁস বা অন্য যা কিছুই মনে হতে পারে, সেটা আমাদের দোষ। আমরা শিখতে পারিনি। আমাদের ড্রয়িং স্যার বিলাসবাবু কিন্তু সত্যিই দারুণ আঁকেন। ক্লাসরুমের বোর্ডে মাঝে মাঝে এতো ভালো আঁকেন যে

আমরা তারিফ না করে পারি না। বাড়িয়ে বলছি না, বিলাসবাবুর আঁকা যে কোনো কেটলী দেখলে অবিকল কেটলীই মনে হবে। বড়োজোর মগ কিংবা কোনো বিলিতী ওয়াটার বটল মনে হতে পারে, কিন্তু আমি হলফ করে বলতে পারি, মিনিবাস বা ক্যারম বোর্ড মনে হতেই পারে না।

মিষ্টভাষী বিলাসবাবুর চলাফেরা, কথা বলা, ছবি আঁকার ভেতর সদাই একটা ছন্দ ফুটে বেরোয়। একহারা সুন্দর চেহারা, পায়ের ডিম অবধি পাঞ্জাবি, কোঁচানো ধুতি, কামানো গোঁফ-দাড়ি আর বাবরি চুলে তাঁকে দেখায় বিলাসবহুল। বিলাসবাবুর কাছে হুংকার আদায় করা রীতিমতো শক্ত কাজ। ভজন পেরেছে। আমরা না দেখেও বলতে পারি ভজনের কেটলীটা নির্ঘাৎ সজারুর মতন দেখতে হয়েছে।

ড্রয়িং ক্লাসের শেষে বিলাসবাবু বললেন, "তোমাদের জন্য একটা 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতার কথা ভাবছি। ভালো ভালো প্রাইজ থাকবে। আমার মনে হয় এতে তোমাদের ছবি আঁকার প্রতি টান অনেক গুণ বেড়ে যাবে। তোমরা কি বল ?"

ছেলেরা লাফিয়ে উঠলো। সক্কলের বিশাল উৎসাহ। কদম উঠে জিজ্ঞেস করলো, "কি আঁকতে হবে স্যার ?"

"সেটা প্রতিযোগিতার সময় বলে দেওয়া হবে"—বলেন বিলাসবাবু।

নয়ন উঠে কান চুলকোলো, "প্রশ্নগুলো কি ক্লাসের পড়ানোর ভেতর থেকেই আসবে স্যার ?"

বিলাসবাবু ভুরু কোঁচকালেন। "এ তোমার পরীক্ষা নয় নয়ন, যে প্রশ্নের কথা উঠছে। এতে পাশ ফেলের ব্যাপারই নেই। আঁকার ভেতর দিয়ে খানিকটা আনন্দ, আর ভালো আঁকলেই প্রাইজ। যেরকম ভেবেছি তাতে তিনটে বিভাগ থাকবে। ক, খ আর গ। তোমরা ক্লাস এইটের ছেলেরা আর নাইন টেন মিলিয়ে 'ক' বিভাগ। ফাইভ সিক্স সেভেন 'খ' বিভাগ আর বাকিরা 'গ' বিভাগ।

"গ' বিভাগ আঁকবে, ধরো একটা পেয়ালা বা কেটলী বা টুথব্রাশ। 'খ' বিভাগ আঁকবে একটা বাঘ, সজারু বা গণ্ডার। কিন্তু 'ক' বিভাগকে মানে তোমাদের, একটু পারিপার্শ্বিক নিয়ে আঁকতে হবে। শকুন্তলার শোক, বাল্মীকির বিরহ বা হংসাসীনার হাস্য-এই ধরনের কিছু আঁকতে হবে।"

সোমেন জানতে চাইলো, "সময় কতক্ষণ স্যার ?"

বিলাসবাবু ঘড়ি দেখলেন, "মোটামুটি দেড় থেকে দু'ঘণ্টা।"

"খু···ব লম্বা করে আঁকতে হবে, তাই না স্যার?" প্রশ্ন করে সমীর।

"কেন? কেন? খু···ব লম্বা করে আঁকবে কেন?" আশ্চর্য হন বিলাসবাবু।

"দু'ঘণ্টা একটানা আঁকলে খুব লম্বা হবে না স্যার?" মাথা চুলকোয় সমীর। "আমি রাস্তায় লোকেদের বসে আঁকতে দেখেছি সেই ওইখান থেকে সেইখান অবধি আঁকে মাত্র এক ঘণ্টায়।"

সমীরের ওইখান থেকে সেইখান অবধি বিলাসবাবুর চোখ দুটো ধাওয়া করলো। বললেন, "না না, লম্বা-টম্বা আঁকতে হবে না! ভালো করে আঁকতে হবে। তা বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় তোমাদের সকলের উৎসাহ আছে তো?"

সারা ক্লাস যেন নেচে উঠলো, "হ্যাঁ স্যার। খুব স্যার। দারুণ স্যার। ভীষণ স্যার।"

"সমস্যা একটাই।" বললেন বিলাসবাবু। "হেডস্যারকে রাজী করানো।

মুহূর্তে হৈচৈ বন্ধ হয়ে গেল। সমস্যাটা যে সহজ নয় সেটা ছাত্র আর স্যার সকলেরই জানা।

* * *

একটু বেশি বকাবকি করলেও হেডস্যার কিন্তু লোক মোটেই খারাপ নন। আমাদের ইস্কুল যে বছর বছর ভালো রেজাল্ট করে, সবাই বলে তা নাকি ওঁরই জন্যে। হেডস্যারের দোষ একটাই। বড্ড সেকেলে। কোনো নতুন প্রস্তাব তাঁর কাছে গেলেই, তিনি মুখটা কোলাব্যাঙ পানা করে বলবেন, "একটু ভেবে দেখি।" পাঞ্জাবীর বোতামগুলো খুলে দিয়ে, চশমাটা নাকের ওপর নামিয়ে, চেয়ারে হেলান দিয়ে এক টিপ নস্যি নেবেন। মিনিট পাঁচেক ভেবে বলবেন, "না হলো না। ওতে ছেলেদের পড়ার ক্ষতি হবে।" ব্যস্, গল্প ওখানেই শেষ। অন্য স্যারেরাও হেডস্যারকে বিশেষ কিছু বলতে সাহস করেন না, একমাত্র বাচস্পতি মশাই ছাড়া। বয়সের জন্যেই হোক আর সংস্কৃত বাক্যবাণের ভয়েই হোক, হেডস্যার বাচস্পতি মশাইকে একটু সমঝে চলেন। অবশ্য বাচস্পতি মশায়ের কথায়ও হেডস্যার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই টলেন না, যদি না যুক্তি খুব অকাট্য হয়।

হেডস্যার টিচার্স-রুমেই ছিলেন। বিলাসবাবু ভেতরে ঢুকে পড়লেন, আর আমরা দরজা দিয়ে অল্প একটু ঢুকে থিয়েটার দেখার মতন কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

হেডস্যার একটু বিরক্ত মুখে ঘাড় ফেরালেন, "কি ব্যাপার বিলাস?"

হেডস্যারের থমথমে মুখ দেখেই বিলাসবাবু বুঝতে পারলেন সময়টা ঠিক মতন বাছা হয়নি। নার্ভাস হয়ে তিনি কানটান চুলকে একাকার করলেন।

"মানে-ইয়ে হচ্ছে গিয়ে···"

"ভণিতা না করে বলেই ফেলো।"

বিলাসবাবু কপাল ঠুকে প্রস্তাবটা সরাসরি পেড়ে ফেললেন।

"আজ্ঞে একটা বসে আঁকো প্রতিযোগিতার কথা···"

হেডস্যারের এরপর যা যা করার কথা, পরপর একে একে করে গেলেন, যেন আগে রিহার্সাল দেওয়া ছিল, এখন স্টেজে দেখাচ্ছেন। শুধু মাঝে একবার টিচার্স-রুমের বেয়ারা ফকিরকে বললেন, "পাখাটা একটু বাড়িয়ে দে তো ফকরে।"

হরি আমার কানে কানে বললো, "কি সাংঘাতিক ব্যাপার দেখেছিস। বাচস্পতি স্যার জেগে রয়েছেন। ওঁর নিশ্চয় শরীর খারাপ।"

টিচার্স-রুমে এরকম অদ্ভুত দৃশ্য আমিও আগে কখনও দেখিনি। বললাম, "নির্ঘাত উদরী হয়েছে।"

"ও হবে না বিলাস"—মাথা নাড়লেন হেডস্যার। "ছেলেদের পড়ার ভীষণ ক্ষতি হবে।"

"কিন্তু স্যার ছুটির দিনে সকালবেলা···" বাচস্পতি মশায়ের দিকে তাকিয়ে হাত কচলালেন বিলাসবাবু। মুখের ভাবটা, আপনি একটু ওকালতি করুন না। বাচস্পতি মশায় মিটিমিটি হাসছেন। অন্য স্যারেরা চুপ। হেডস্যার ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, "আরে ছুটির দিনেই তো ছেলেরা পড়বে। ইস্কুলের দিনে কি আর পড়া হয়?"

এই অকাট্য যুক্তির সামনে বিলাসবাবু একেবারে বোল্ড আউট। ব্যর্থ, ব্যথিত নেপোলিয়নের মতন মাথা হেঁট করে ফিরে আসছেন, এমন সময় নয়ন আমার পাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠলো, "কিন্তু স্যার, তাহলে সরোজনলিনী বিদ্যালয়ের ছেলেরা আমাদের দুয়ো দেবে না?"

লাফিয়ে উঠলেন হেডস্যার, "কেন? কেন? দুয়ো দেবে কেন?"

"দেবে না স্যার, দিতে শুরু করে দিয়েছে। ওদের স্কুলে দেড় বছর আগে 'বসে আঁকো প্রতিযোগিতা' চালু হয়ে গেছে।"

নয়নের কথায় হেডস্যার পড়লেন মহাফাঁপরে। বেশ কিছুক্ষণ জোরে জোরে পায়চারি করে বললেন, "তাহলে তো আর উপায় নেই। হোক বসে আঁকো প্রতিযোগিতা।"

বাচস্পতি মশাই একটু চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, "কিন্তু ছুটির দিন সকালে ছেলেরা পড়বে না?"

হেডস্যার বললেন, "রাখুন তো মশাই। ছুটির দিনে সব কতো পড়ে তা জানা আছে। তাছাড়া ছুটির দিনের কি দরকার? একটা ইস্কুলের দিনে, কটা পিরিয়ড অফ করেও তো হতে পারে।"

বিলাসবাবুর মুখটা দেখে মনে হলো হাতে চাঁদ পেয়েছেন। নয়নটা ক' বছর ক্লাস এইটে থেকে বড্ড ভারিক্কি হয়ে গেছে, না হলে বিলাসবাবু নির্ঘাত ওকে কোলে তুলে নিতেন।

বিলাসবাবুর মনোবল ফিরে এসেছে। হেডস্যারকে সরাসরি বললেন, "কিছু খরচা আছে কিন্তু স্যার।"

হেডস্যার মুখটা আবার কোলাব্যাঙপানা করলেন। বাজে খরচ উনি মোটেই বরদাস্ত করতে পারেন না। তা সে স্কুলের টাকাই হোক আর নিজের টাকাই হোক।

"তা কতো লাগবে?" ভুরু কোঁচকালেন হেডস্যার।

"শ চারেকের ভেতর হয়ে যাবে মনে হয়"—বললেন বিলাসবাবু। "শ খানেক টাকার রং আর কাগজ, তিনটে বিভাগ মিলিয়ে দেড়শো টাকার প্রাইজ, তাছাড়া বিচারক-মণ্ডলী ও ভলাণ্টিয়ারদের যাতায়াত, খাওয়া-দাওয়া আর ব্যানার লেখা মিলিয়ে ধরুন আরো দেড়শো।"

"ওর থেকে কমানো যায় না?" প্রশ্ন করলেন হেডস্যার।

"খরচ কমানোর জন্য আমার একটা প্রস্তাব ছিল, অনুমতি পেলে বলি," বললেন আমাদের সবচেয়ে অল্পবয়সী স্যার কেমিস্ট্রির ফটিকবাবু।

হেডস্যারের চোখ চকচক করে উঠলো, "বলবে বৈকি, একশোবার বলবে।"

"রংগুলো সব আমি স্কুলেই তৈরি করে দিতে পারি।" গর্বের হাসি হাসলেন ফটিকবাবু আমাদের দিকে চেয়ে। "কি! তোমরা কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরিতে রঙের কারসাজি দেখোনি? লাল, নীল, হলুদ, সবুজের খেলা?"

সামনে হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষা। আমরা সমস্বরে সম্মতি জানালাম। "বাকি রংগুলো তো এদেরই সংমিশ্রণ" বললেন ফটিকবাবু, "ব্যবসাদারেরা বড়ো বেশি দাম নেয় স্যার। আমাদের ওই একশো টাকার রং তৈরি করতে খুব সামান্যই খরচ হবে। বেশির ভাগ কেমিক্যালই আমাদের ল্যাবরেটরিতে আছে।"

ফটিকবাবুর রং তৈরির কথাগুলো বিলাসবাবুর ঠিক পছন্দ হয়নি। তিনি এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন। হেডস্যার কিন্তু আনন্দে উত্তেজিত হয়ে বললেন, "আরে এই রকমই তো চাই। বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, নিজেদের রঙে। বুঝলে বিলাস, ব্যানার যদি লেখা হয় তাহলে 'নিজেদের রঙে' কথাটা লিখতে ভুলো না কিন্তু। অন্তত ব্র্যাকেটে দিয়ে দিও।"

সকলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। টাকার জন্যে প্রতিযোগিতা বানচাল

হতে বসেছিল, ফটিকবাবু একা সামলালেন। বাচস্পতি মশাই বললেন, "সাবাস ফটিক, তুমি রঙের খরচটাই শুধু বাঁচালে না, বিলাসকেও বাঁচালে।"

"একটু খরচ কিন্তু হবেই," বললেন ফটিকবাবু। "অবশ্য টাকা কুড়িক মাত্র। কিছু এমোনিয়া কিনতে হবে। আঁকার কাগজগুলো ঘণ্টাখানেক অন্তত এমোনিয়ার জলে চুবিয়ে রাখতে হবে কিনা। রং-গুলো স্পষ্ট করে তুলতে ওই ভেজানো কাগজেই আঁকতে হবে তো। একটু রোদে বসে।"

পুরো তিরিশ সেকেণ্ড লাগলো সকলের ব্যাপারটা বুঝতে।

হেডস্যার খেঁকিয়ে উঠলেন, "তোমার ছেলেমানুষী থামাবে ফটিক?"

বাচস্পতি মশাই বললেন, "অমৃতং বালভাষিতং।"

বিলাসবাবুর মুখে হাসি ফিরে এলো। আর ছেলেরা হাসি চাপতে এমন সব বিকট আওয়াজ করলো যা দশটা গ্রে হাউণ্ড কুকুরেও পারবে না।

হেডস্যার সাব্যস্ত করলেন, প্রতিযোগিতা হবেই। রং প্রয়োজন মতন কিনে নিলেই চলবে। তিনশ লাগে, পাঁচশো লাগে, নো পরোয়া।

টিচার্স-রুম থেকে বেরিয়ে বিলাসবাবু নয়নকে বললেন, "তুমি তো অনেক খবর রাখো হে। সরোজনলিনীর কথাটা আমার মোটেই জানা ছিল না।"

নয়ন বলল, "আমারও ঠিক জানা নেই স্যার, কিন্তু হতেও তো পারে।"

বিলাসবাবু প্রথমে থতমত খেলেন, তারপর হাসতে হাসতে নয়নের পিঠ চাপড়াতে গিয়েও হাতটা গুটিয়ে নিলেন।

প্রতিযোগিতার দিন স্থির হলো মহালয়ার আগের দিন। গ্রীষ্মের আগুনের হল্কা যাবে কমে। থেমে যাবে বর্ষার একটানা ঘ্যানঘ্যানানি। মনে রং না থাকলে ছবির রং ফোটে না। শরতের চিকন আকাশের রঙে রং মিলিয়ে, ছেলেদের মন উঠবে চিকচিকিয়ে। মহালয়ার দিন থেকে পুজোর ছুটি। শেষ দিনটায় এমনিতেই বিশেষ পড়াশোনা হয় না, তাই পড়ার ক্ষতিও তেমন হবে না।

বিবাসবাবুর পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনটে বিভাগ হবে। 'ক' বিভাগে এইট, নাইন, টেন। যদিও আঁকার ক্লাস এইটেই শেষ। 'খ' বিভাগে ফাইভ, সিক্স, সেভেন আর বাকিরা 'গ' বিভাগে।

একেকটা বিভাগ একেকটা ক্লাস-রুমে বসবে। ক্লাস-রুমগুলো বেশ বড়ো। অন্তত পঞ্চাশজন তো অনায়াসেই ধরে যাবে। প্রত্যেক বিভাগে তিনটে করে বিষয়। যে কোনো একটা আঁকতে হবে। প্রাইজও তিনটে। একেকটি একেক বিষয়ে। সবগুলোই ফার্স্ট প্রাইজ। বিচারকমণ্ডলী বলতে দুজন। বিলাসবাবু স্বয়ং আর তাঁর এক বিখ্যাত আর্টিস্ট বন্ধু প্রলয় ঘোষ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য আমাদের মতন বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবক বা ভলাণ্টিয়ার জুটে গেছে। তাদের জন্য থাকবে কচুরি, আলুর দম, মিষ্টি আর চা। রং আর কাগজ দেবে স্কুল, কিন্তু পেন্সিল তুলি ইত্যাদি প্রতিযোগীদের আনতে হবে। এক কথায় ব্যবস্থা পাকা।

আমাদের ক্লাসের নিমাইচন্দ্র দাসের মামা খুব নামজাদা আর্টিস্ট। আমরা ওঁর ছবি দেখেছি। নিমাইয়ের কথা যে মিথ্যে নয় তা ওঁর ছবি দেখলেই বোঝা যায়। খাড়া নাক, আর লম্বা লম্বা ঢেউ খেলানো চুলের সঙ্গে সুন্দর ঢুলুঢুলু চোখ মিলিয়ে কেমন একটা আর্টিস্ট আর্টিস্ট গন্ধ ভুরভুর করছে। নিমে মাঝে মাঝেই মামাবাড়ি গিয়ে ওঁর কাছে তালিম নেয় আর প্রায়ই ওর ড্রয়িং খাতা খুলে আমাদের নতুন নতুন সব ছবি দেখায়। ক্লাসের অনেকেই বলল, "'ক' বিভাগের একটা প্রাইজ নিমে পাবেই।"

নিমে মুখটা লাজুকপানা করে বলল, "চেষ্টা তো করতে হবেই, ক্লাসের একটা প্রেস্টিজ আছে না।"

দিন পনের যেতে না যেতেই শোনা যেতে লাগল যে ক্লাস এইট, নাইন আর টেনের সব সেকশন মিলিয়ে অন্তত পনেরো জন আছে যাদের আত্মীয়দের কেউ না কেউ খুব ভালো আর্টিস্ট। 'ক' বিভাগের একটা প্রাইজ পাওয়ার জন্য তারাও নাকি প্রাণপণ লড়ে যাবে। নিচু ক্লাসের ছেলেদের উৎসাহ অনেক কম। তাই তাদের আত্মীয়েরা আর্টিস্ট কিনা সে খবর পাওয়া গেল না। বোঝা গেল না, 'খ' ও 'গ' বিভাগে প্রতিযোগিতা কি রূপ নেবে।

প্রতিযোগিতার দিন সকালে দেখা গেল স্কুলের দারোয়ান শিউচরণ চানটান সেরে ফিটফাট হয়ে ক্লাস-রুমের সামনে পায়চারি করছে। শিউচরণ স্কুলের গেটের কাছেই বিচরণ করে, এদিকে বড়ো একটা আসে না।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, "তুমিও নাম দিয়েছ নাকি?"

শিউচরণ তার বিরাট টিকি দুলিয়ে এমন একগাল হাসি দিল যার থেকে কিছুই বোঝা গেল না।

প্রতিযোগীরা নিজেদের ঘরে বসল, 'ক' বিভাগে পঁচিশজন, 'খ'য়ে সাতাশ আর 'গ'য়ে চল্লিশ। 'গ' বিভাগের অনেকেরই অভিভাবকেরা এসেছেন। চিন্তিত মুখ দেখলে মনে হবে ওঁরাই প্রতিযোগী।

আঁকার বিষয়গুলি বোর্ডে লিখে দেওয়া হলো।

'গ' বিভাগে (১) ছাতা (২) খোলা বই (৩) কেটলী।

'খ' বিভাগে (১) মোরগ (২) টিকটিকি (৩) উটপাখি।

'ক' বিভাগে (১) তারার একাকীত্ব (২) উন্মত্ত অজগর
(৩) শিউচরণের প্রতিকৃতি।

আঁকা চলছে জোরকদমে। আমরা বেশ কজন ভলান্‌টিয়ার তিনটে ঘরে ঘুরে ঘুরে আঁকার রং, কাগজ আর জল সাপ্লাই করছি। জলের অবশ্য বেশির ভাগটাই খাবার জন্য। কেউ আঁকছে এক রঙে আর কেউ রঙের ফুলঝুরি ছড়াচ্ছে। উঁকি দিয়ে যেটুকু দেখতে পাচ্ছি তাতে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। শেষ হলে নির্ঘাত বোঝা যাবে।

ক্লাস সেভেনের একটা ছেলে আমাকে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা উটপাখির কি ডানা থাকে?"

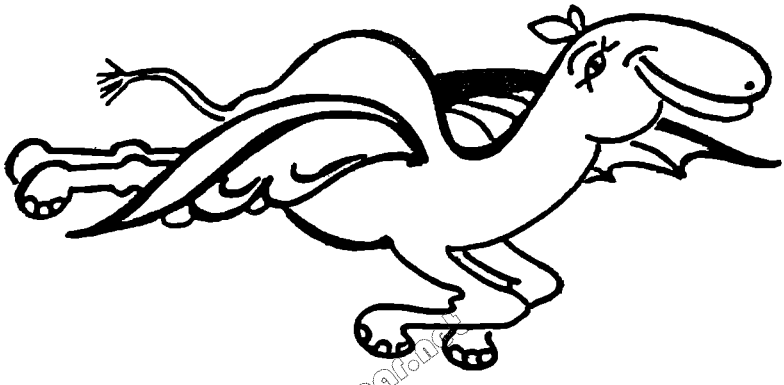

একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে বললাম, "পাখি যখন, ডানা তো থাকবেই।"

"কুঁজ থাকে নাকি?" শুধোয় ছেলেটা।

আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম, "উট যখন, কুঁজ থাকাই তো স্বাভাবিক।"

কিছুক্ষণ বাদে ছেলেটা খাবার জল চাইলো। জল দিতে গিয়ে দেখি সুন্দর উটপাখি এঁকেছে। উটের গায়ে দুটো ডানা। উড়ন্ত

উটপাখি। চার পা আর দুটো ডানা মেলে নীল আকাশে সুন্দর উড়ে বেড়াচ্ছে। বুরুশের মতন একটা লেজ দিতেও ভোলেনি ছেলেটা।

প্রতিযোগিতা যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, হরির হাত লেগে ক্লাস নাইনের নিশীথের আঁকার ওপর নীল রং উল্টে গেল। নিশীথ হরিকে এই মারে তো সেই মারে। অনেক কষ্টে তাকে ঠাণ্ডা করা গেল। নিশীথ রেগে-মেগে আঁকার কাগজ টাগজ জমা দিয়ে দিল।

বিলাসবাবু কাগজটা জমা নিতে গিয়ে বললেন, "তুমি কাগজের পেছনে নাম আর ক্লাস লিখতে ভুলে গেছ।"

নাম-টাম লিখে গট্‌গট্‌ করে বেরিয়ে এল নিশীথ। 'ক' বিভাগে শিউচরণ ঠায় বসে আছে। দৃপ্ত ভঙ্গি, চওড়া কপাল, খাড়া নাক ইয়া মোটা টিকি, টিকির শেষে গিঁট। যারা ওর প্রতিকৃতি আঁকছে তারা থেকে থেকেই কাছে এসে খুঁটিয়ে দেখে যাচ্ছে।

দেড় ঘণ্টা কেটে গেল। প্রতিযোগিতা শেষ। আমরা লেগে গেলাম কচুরি আর সন্দেশের পেছনে। বিচারকমন্ডলীরও খাওয়া শেষ, এবার বিচারে বসবেন।

সময় বাঁচানোর জন্য বিচারকমণ্ডলী ঠিকই করে রেখেছিলেন যে প্রত্যেক বিভাগে একেকটা বিষয়ের শ্রেষ্ঠত্ব নির্বাচন করে হাতে হাতেই প্রাইজ দিয়ে দেবেন।

'গ' বিভাগের ছাতা আর কেটলীর জন্য প্রাইজ পেল সুভাস আর অজয়। খোলা বই কেউই আঁকেনি, প্রাইজটা থেকেই গেল।

'খ' বিভাগে প্রাইজ পেলো ভাস্কর, জ্যোতি আর প্রকাশ। আমি ভেবেছিলাম, সেই উটপাখি আঁকা ছেলেটা প্রাইজ পাবেই কিন্তু ছেলেটা পরে আমার কাছে অভিযোগ করেছিল, "তুমি আমায় একটু বলে দিলে না যে উটপাখির মোটে দুটো পা। প্রাইজটা একটুর জন্য ফস্কে গেল।"

আমরা উৎসুক হয়েছিলাম 'ক' বিভাগের বিচারের জন্য। ক্লাসের প্রেস্টিজ বলে কথা।

বিচার শুরু হলো। জোরালো প্রতিযোগী ষোলজন যাদের আত্মীয়েরা আর্টিস্ট। বাকি নজন একরকম এলেবেলে।

বিচারকেরা একের পর এক আঁকার কাগজগুলোতে চোখ বোলাচ্ছেন আর আমরা নিশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করছি।

"তারার একাকীত্ব" বিচারকেরা পরের পর ছবি দেখতে দেখতে থেমে গেলেন একটা ছবিতে। ছবিটার দারুণ তারিফ করলেন প্রলয় ঘোষ

আর বিলাসবাবু। "নাঃ, ছেলেটার আইডিয়া আছে। তারার মুখটা কেমন ম্লান দেখেছ, মেঘাচ্ছন্ন আকাশে একটি মাত্র তারা।"

প্রাইজ পেল নাইন-এর নিশীথ রায়।

হরি বললো, "এ প্রাইজটা কিন্তু আমারই প্রাপ্য। রংটা না ওল্টালে ও জীবনে প্রাইজ পেত? আমি ওর আঁকা দেখিনি? ও তো পাখি আঁকতে পাঁঠা আঁকে!"

উন্মত্ত অজগরের প্রাইজটা পেল ক্লাস টেনের সুধীর। কারো কিছু বলার নেই। ছবিটা সত্যিই দুর্দান্ত হয়েছে মনে হচ্ছে অজগরটা গিলতে আসছে। নিমে আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। ওর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, প্রচণ্ড উত্তেজিত। যে কোনো মুহূর্তে যা কিছু একটা ঘটে যেতে পারে।

তৃতীয় এবং শেষ বিষয় 'শিউচরণের প্রতিকৃতি'। একে একে সব ছবিগুলো দেখলেন বিচারকেরা। একটা ছবির খুব তারিফ হলো। দেখেছ, "গালের তিলটা পর্যন্ত বাদ যায়নি।" বিচারের রায় ঘোষণা হলো। শিউচরণের শ্রেষ্ঠ প্রতিকৃতির জন্য প্রাইজ, নিমাইচন্দ্র দাস।

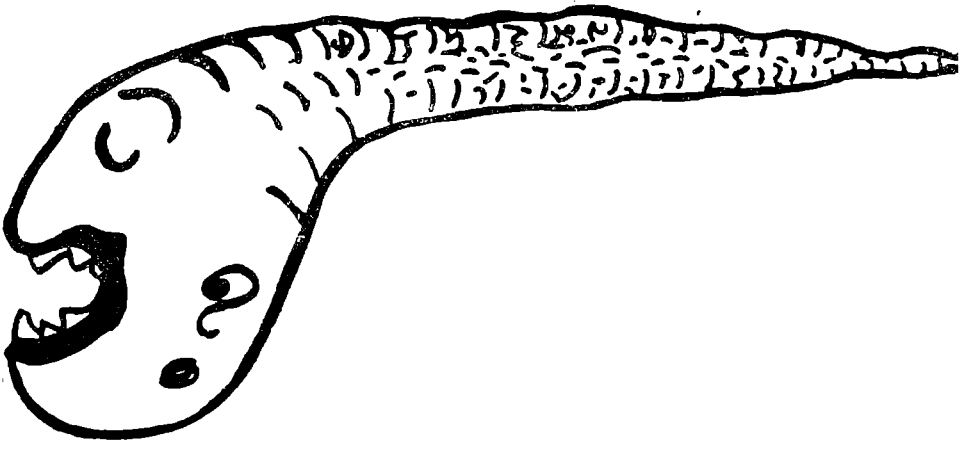

হাততালিতে ক্লাস এইটের 'এ' সেক্সনের ছেলেরা মানে আমরা ফেটে পড়লাম। নিমে গিয়ে প্রাইজ নিয়ে এলো। নয়ন নিমেকে কোলে তুলে নিল। আমরা নিমেকে ঘিরে হিপ-হিপ-হুররে যোগে নাচতে থাকলাম। আজ নিমেই আমাদের প্রেস্টিজ রেখেছে।

শিউচরণ দৌড়ে এল। প্রতিকৃতির একটা কপি তার চাইই! সে দেশে পাঠাবে। আমি বললাম, "আমিও একটা রাখবো।" ঠিক হলো ছবিটার ক'টা জেরক্স কপি করানো হবে।

নিমে বেশ উত্তেজিত কিন্তু আমাদের মতন আত্মহারা নয়। হয়তো আগে থেকে ভেবেই রেখেছিল যে প্রাইজটা ও পাবেই।

আমি আর নিমে হস্টেলে ফিরছি, নিমে চুপচাপ হাঁটছে, হাতে প্রাইজের বই আর শিউচরণের প্রতিকৃতি আঁকা কাগজটা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কিরে? তোর প্রাইজ পাওয়াতে আমরা এতো উত্তেজিত আর তুই ঠাণ্ডা মেরে গেলি কেন?"

নিমে হাসলো, "বিচারকগুলো বোগাস।"

"কেন তোকে প্রাইজ দেওয়াটা ওঁদের উচিত হয়নি?"

"ওরা অজগরটাকে চিনতেই পারেনি। ছবিটা দেখেছে উল্টো করে ধরে।"

নিমের হাত থেকে আমি ছবিটা টেনে নিয়ে উল্টো করে দেখলাম একটা অজগর আর তিমিমাছের মাঝামাঝি জন্তুর গায়ে পরিষ্কার স্বাক্ষর—। নিমাই দাস (ক)।

"এটা যে তোর ছবি সেটা চিনলো কি করে?"

"নামটা যে কাগজটার উল্টো পিঠেও আছে।"

pathagar.net

———

papai